চতুর্থ অধ্যায়
সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর তাকওয়া ও পরহেজগারীর বর্ণনা

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর প্রত্যেকটি আদব ও অভ্যাস গ্রহণযোগ্য এবং অনুসরণযোগ্য। আর হইবেই না কেন? আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্য এই জামাতকে নির্বাচন ও বাছাই করিয়াছেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমি মানবজাতির সর্বোত্তম যুগে প্রেরিত হইয়াছি।' (শিফা) তাই সর্বদিক দিয়া এই যুগ কল্যাণের যুগ ছিল এবং যুগের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম লোকদেরকে তাঁহার সাহচর্যে রাখা হইয়াছে।

(১) হুযূর (সঃ)এর একটি জানাযা হইতে ফিরিবার পথে একজন মহিলার দাওয়াত

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযা হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এমন সময় জনৈকা মহিলার পক্ষ হইতে খানার দাওয়াত আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন খাদেমদের সহ মহিলার বাড়ীতে গেলেন। অতঃপর খানা সম্মুখে পেশ করা হইলে লোকেরা দেখিতে পাইল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকমা চিবাইতেছেন কিন্তু গিলিতে পারিতেছেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনে হইতেছে এই বকরীর গোশ্‌ত মালিকের অনুমতি ব্যতীত আনা হইয়াছে। মহিলা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বকরীর পাল হইতে বকরী খরিদ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম সেখানে পাওয়া যায় নাই। আমার প্রতিবেশী বকরী খরিদ করিয়াছিল। আমি তাহার নিকট মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করার জন্য পাঠাইলাম তখন তাহাকে পাওয়া যায় নাই, তাহার স্ত্রী বকরীটি পাঠাইয়া দিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা কয়েদীদেরকে খাওয়াইয়া দাও। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা ও শান হিসাবে একটি সন্দেহযুক্ত খাবার গলায় আটকাইয়া যাওয়া বড় কিছু নয়। যেখানে তাঁহার অনুসারী সাধারণ গোলামদেরও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

(২) সদকার খেজুরের আশঙ্কায় হুযূর (সঃ)-এর সারারাত্র জাগরণ

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র অনিদ্রা অবস্থায় এপাশ–ওপাশ করিতে থাকেন। বিবিগণের মধ্য হইতে কেহ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনার ঘুম আসিতেছে না? এরশাদ ফরমাইলেন, একটি খেজুর পড়িয়া ছিল। নষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া উঠাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন উহা সদকার খেজুর কিনা এই ব্যাপারে আশঙ্কা হইতেছে।

ফায়দা ঃ উহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব খেজুর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু সদকার মালও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিত, এই সন্দেহের কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারারাত্রি ঘুম আসে নাই যে, খোদা না করুন উহা সদকার হইতে পারে এবং এমতাবস্থায় সদকার মাল খাওয়া হইয়াছে। ইহা হইল আমাদের মনিবের অবস্থা যে, শুধু সন্দেহের উপর সারারাত্র পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন এবং ঘুম আসিল না। এখন তাঁহার গোলামদের অবস্থা দেখুন কেমন আনন্দের সাথে সুদ, ঘুষ, চুরি ও ডাকাতির মাল খাইতেছে। আবার গর্বের সহিত নিজেকে তাঁহার গোলাম বলিয়া দাবী করিতেছে।

(৩) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর এক গণকের খানা খাইবার কারণে বমি করা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর একটি গোলাম ছিল। সে দৈনিক উপার্জনের একটা নির্দিষ্ট অংশ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে দিত। একবার সে কিছু খাবার আনিল আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) উহা হইতে এক লোকমা খাইয়া ফেলিলেন। গোলাম বলিল, আপনি তো প্রতিদিন উপার্জনের উৎস জিজ্ঞাসা করিতেন, আজ তো জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি বলিলেন, আজ প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয় নাই। এখন বল। সে বলিল, জাহেলিয়াতের যুগে আমি এক গোত্রের নিকট গমন করি এবং তাহাদের জন্য মন্ত্র পাঠ করি। তাহারা আমাকে কিছু দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছিল। আজ যখন আমি সেখান দিয়া যাইতেছিলাম তখন তাহাদের সেখানে বিবাহ অনুষ্ঠান চলিতেছিল। তাহারা আমাকে এই খাবার দিয়াছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে ধ্বংসই করিয়া দিতে। অতঃপর তিনি গলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া বমি করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একটি মাত্র লোকমা তাহাও প্রচণ্ড ক্ষুধার অবস্থায় খাইয়াছিলেন বাহির হইল না।

কেহ বলিল, পানি দ্বারা বমি হইতে পারে। তিনি বিরাট এক পেয়ালায় পানি আনাইলেন এবং পানি পান করিয়া করিয়া বমি করিতে থাকিলেন, শেষ পর্যন্ত ঐ লোকমা বাহির করিয়া ফেলিলেন। কেহ বলিল, আল্লাহ আপনার উপর রহক করুন, এই একটি লোকমার কারণে এত কষ্ট সহ্য করিলেন? তিনি বলিলেন, আমার প্রাণের বিনিময়েও যদি উহা বাহির হইয়া আসিত তবু আমি উহা বাহির করিতাম। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে শরীর হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয় উহার জন্য জাহান্নামই শ্রেয়। আমার এই ভয় হইল যে, আমার শরীরের কোন অংশ এই লোকমা দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া যায়।

(মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল)

ফায়দা ঃ এই ধরনের ঘটনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। কারণ, তাঁহার স্বভাবের মধ্যে সতর্কতা ও সাবধানতা ছিল অত্যধিক। সামান্য একটু সন্দেহ হইলেই তিনি বমি করিয়া ফেলিতেন।

বুখারী শরীফে এই ধরনের আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কোন এক গোলাম জাহেলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে জ্যোতিষীদের মত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে উহা সঠিক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই গোলামকে কিছু দিল। সে উহা হইতে নির্ধারিত অংশ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে দিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) উহা খাইলেন এবং পরে যাহা কিছু পেটে ছিল সবই বমি করিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।

উল্লেখিত ঘটনাবলীতে ইহা জরুরী নহে যে, গোলামদের মাল নাজায়েযই হইবে। উভয়টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর অতি সতর্কতা ঐ সন্দেহযুক্ত মালকেও পছন্দ করিল না।

(৪) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সদকার দুধপান করার কারণে বমি করা

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার কিছু দুধপান করিলেন, কিন্তু উহার স্বাদ অস্বাভাবিক ও ভিন্ন রকম মনে হইল। যে ব্যক্তি পান করাইয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুধ কিভাবে ও কোথা হইতে আসিয়াছে? সে বলিল, অমুক মাঠে সদকার উট চরিতেছিল। আমি সেখানে গেলে তাহারা দুধ দোহন করিল। সেই দুধ হইতে তাহারা আমাকেও দিল। হযরত

ওমর (রাযিঃ) মুখে হাত ঢুকাইয়া সমস্ত দুধ বমি করিয়া ফেলিলেন।

(মুআত্তা ইমাম মালেক)

ফায়দা ঃ এই সমস্ত বুযুর্গের সর্বদা এই চিন্তা থাকিত যে, সন্দেহযুক্ত মালও যেন শরীরের অংশে পরিণত না হয়। সম্পূর্ণ হারাম মালের তো প্রশ্নই আসে না যাহা আমাদের এই যমানায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

(৫) সতর্কতা স্বরূপ হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর বাগান ওয়াক্‌ফ করা

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, বাইতুল–মাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতে আমার মন চাহিতেছিল না। কিন্তু ওমর (রাযিঃ) মানিলেন না এবং বলিলেন যে, ইহাতে কষ্ট হইবে আর আপনার ব্যবসায় মশগুল হওয়ার কারণে মুসলমানদের ক্ষতি হইবে। এইজন্য বাধ্য হইয়া আমাকে বাইতুল মাল হইতে ভাতা গ্রহণ করিতে হইল। এখন উহার পরিবর্তে আমার অমুক বাগানটি যেন দিয়া দেওয়া হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর নিকট লোক পাঠাইলেন এবং পিতার অসিয়ত অনুযায়ী সেই বাগানটি দান করিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তোমার পিতার উপর রহম করুন। তাহার উদ্দেশ্য হইল যে, কাহাকেও মুখ খুলিবার সুযোগই দিবেন না। (কিতাবুল আমওয়াল)

ফায়দা ঃ চিন্তা করার বিষয় এই যে, প্রথমতঃ উহার পরিমাণই বা কি ছিল যাহা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বাইতুল মাল হইতে লইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ উহাও বিজ্ঞ সাহাবাদের বারবার অনুরোধ ও মুসলমানদের স্বার্থের কারণেই লইয়াছিলেন। তদুপরি ইহাতেও যতটুকু সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল তাহা করিয়াছেন, যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪নং ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তাহার স্ত্রী কষ্ট করিয়া কম খাইয়া মিষ্টি খাওয়ার জন্য কিছু পয়সা জমা করিলেন, তাহাও তিনি বায়তুল মালে জমা করিয়া দিলেন এবং ঐ পরিমাণ ভাতা হইতে সব সময়ের জন্য কমাইয়া দিলেন। এই সব কিছুর পরেও শেষ কাজ এই করিলেন যে, যাহা লইয়াছিলেন উহারও বিনিময় দিয়া দিলেন।

⑥ হযরত আলী ইবনে মা'বাদ (রহঃ)এর ভাড়া ঘরের মাটি দ্বারা লেখা শুকানো

জনৈক মুহাদ্দিস আলী ইবনে মা'বাদ (রহঃ) বলেন, আমি একটি ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতাম। একবার আমি কিছু লিখিবার পর উহা শুকাইবার জন্য মাটির প্রয়োজন হইল। কাঁচা দেওয়াল ছিল। মনে মনে ভাবিলাম ইহা হইতে কিছু মাটি ঘঁষিয়া লইয়া লিখার উপর ছিটাইয়া দিব। পরে মনে আসিল, ইহা তো ভাড়া ঘর, শুধু থাকার জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে, মাটি ব্যবহার করার জন্য নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই খেয়ালও আসিল যে, সামান্য একটু মাটি তেমন কি অসুবিধা হইবে। ইহা একটি নগণ্য জিনিস। অতএব মাটি নিলাম। রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিতেছে, কাল কেয়ামতের দিন বুঝা যাইবে ইহা বলা যে, 'সামান্য মাটি কি জিনিস।'

ফায়দা ঃ 'কাল কেয়ামতের দিন বুঝা যাইবে'—ইহার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাকওয়ার অনেক স্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে কামেল স্তর নিশ্চয়ই এই ছিল যে, এই সামান্য মাটি গ্রহণ করা হইতেও বিরত থাকা। যদিও ইহা সাধারণতঃ মামুলী জিনিস হিসাবে জায়েযের সীমার ভিতরেই ছিলে।

(এহ্ইয়া)

⑦ হযরত আলী (রাযিঃ)-এর এক কবরের নিকট দিয়া গমন

কুমাইল নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি একবার হযরত আলী (রাযিঃ)এর সাথে যাইতেছিলাম। তিনি একটি ময়দানে পৌঁছিলেন। অতঃপর একটি কবরস্থানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে কবরবাসী! হে জরা–জীর্ণ! হে নির্জনবাসী! তোমাদের কি খবর, কি অবস্থা? ইহার পর বলিলেন, আমাদের খবর তো এই যে, তোমাদের পর সমস্ত ধনসম্পদ বন্টন হইয়া গিয়াছে। সন্তানেরা এতীম হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীরা অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। ইহা তো আমাদের খবর। তোমাদের নিজেদেরও কিছু শুনাও। অতঃপর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কুমাইল! ইহাদের যদি কথা বলিবার অনুমতি হইত এবং কথা বলিতে পারিত, তবে তাহারা উত্তরে এই বলিত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল তাকওয়া। এই কথা বলিয়া তিনি কাঁদিতে শুরু করিলেন এবং বলিলেন, হে কুমাইল! কবর হইতেছে আমলের সিন্দুক। মৃত্যুর সময় সব কথা জানা হইয়া যায়।

(মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ সিন্দুকে যেমন মাল সংরক্ষিত থাকে তদ্রূপ মানুষ ভালমন্দ আমল যাহা করে উহা তাহার কবরে সংরক্ষিত থাকে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, নেক আমল সুন্দর মানুষের আকৃতি ধারণ করে এবং মৃত ব্যক্তিকে আনন্দ ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্য তাহার সহিত থাকে। আর মন্দ আমল কুৎসিত আকার ধারণ করিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া হাজির হয় যাহা মৃত ব্যক্তির জন্য আরও বেশী কষ্টের কারণ হয়।

এক হাদীসে আছে, মানুষের সাথে তিন জিনিস কবর পর্যন্ত যায় ঃ তাহার মাল, যেমন আরবে ইহার প্রচলন ছিল, তাহার আত্মীয়–স্বজন ও আমল। তন্মধ্যে দুইটি অর্থাৎ মাল ও আত্মীয়–স্বজন দাফনের পর ফিরিয়া আসে আর আমল তাহার সাথে থাকিয়া যায়।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান— তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার–পরিজন এবং মাল ও আমলের উদাহরণ কি? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জানিতে চাহিলে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহার উদাহরণ এইরূপ যে, এক ব্যক্তির তিন ভাই আছে এবং মৃত্যুকালে সে এক ভাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার অবস্থা তোমার জানা আছে যে, আমার উপর দিয়া এখন কি বিপদ অতিবাহিত হইতেছে। এই সময় তুমি আমার কি সাহায্য করিবে? সে বলিল, আমি তোমার সেবাযত্ন করিব, চিকিৎসা করিব, সর্বপ্রকার খেদমত করিব। মৃত্যুর পর গোসল দিব, কাফন পরাইয়া কাঁধে বহণ করিয়া লইয়া যাইব এবং দাফন করিবার পর তোমার প্রশংসা করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ভাই হইল পরিবার–পরিজন। অতঃপর দ্বিতীয় ভাইকে একই প্রশ্ন করিলে সে বলে যে, আমার এবং তোমার সম্পর্ক শুধু হায়াতের সহিত। তোমার মৃত্যুর পর আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব। এই ভাই হইল মাল। অতঃপর তৃতীয় ভাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, আমি কবরে তোমার সঙ্গী হইব, নির্জন স্থানে তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিব, তোমার হিসাবের সময় নেকীর পাল্লায় বসিয়া উহা ঝুকাইয়া দিব। এই ভাই হইল আমল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখন বল কোন্ ভাই উপকারে আসিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তৃতীয় ভাইই উপকারে আসিল। আর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাই কোন উপকারেই আসিল না। (মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল)

(৮) হুযূর (সাঃ)এর এরশাদ-যাহার খানা-পিনা হালাল নয় তাহার দোআ কবুল হয় না

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র আর তিনি পবিত্র মালই কবুল করেন। তিনি মুসলমানদেরকে ঐ জিনিসের আদেশ দিয়াছেন যাহার প্রতি স্বীয় রসুলগণকে আদেশ দিয়াছেন। যেমন কুরআনে কারীমে এরশাদ হইয়াছে— يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۔

অর্থাৎ, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র জিনিস আহার কর এবং নেক আমল কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের আমল সম্বন্ধে অবগত আছি।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۔

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আমার প্রদত্ত পবিত্র রিযিক হইতে আহার কর।

ইহার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিলেন যে, সে দীর্ঘ সফর করে। (আর মুসাফিরের দুআ কবুল হয়) এবং তাহার চুল এলোমেলো, কাপড় ধুলায় ধূসরিত। (অর্থাৎ পেরেশান অবস্থা) এমতাবস্থায় দুই হাত উপরের দিকে তুলিয়া বলে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! কিন্তু তাহার খাদ্যও হারাম, পানিও হারাম, পরিধানের কাপড়ও হারাম। সর্বদা হারামই খাইয়াছে। অতএব তাহার দোয়া কীভাবে কবুল হইতে পারে? (জামউল ফাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ লোকেরা সর্বদা চিন্তা করিয়া থাকে যে, মুসলমানদের দোয়া কেন কবুল হইতেছে না। কিন্তু উপরোক্ত হাদীস দ্বারা অবস্থার কিছুটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজ মেহেরবানীর দ্বারা কখনও কাফেরের দোয়াও কবুল করিয়া লন, সেখানে ফাসেকের দোয়া তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তবুও মুত্তাকীদের দোয়াই প্রকৃত দোয়া। এইজন্য মুত্তাকীদের নিকট দোয়া কামনা করা হয়। যাহারা চায় যে, আমাদের দোয়া কবুল হোক, তাহাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী হইল তাহারা যেন হারাম মাল হইতে বিরত থাকে। আর এমন কে আছে, যে এই কামনা করে যে, আমার দোয়া কবুল না হউক।

(৯) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর নিজ স্ত্রীর দ্বারা মেশ্‌ক ওজন করাইতে অস্বীকৃতি

একবার হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেদমতে বাহরাইন হইতে মেশক আসিলে তিনি বলিলেন, কেহ যদি ইহা ওজন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিত। তাঁহার স্ত্রী আতেকা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি ওজন করিয়া দিব। তিনি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, কেহ যদি ইহা ওজন করিয়া দিত তবে আমি বন্টন করিয়া দিতাম। তাঁহার স্ত্রী আবারও বলিলেন, আমি ওজন করিয়া দিব। তিনি নীরব রহিলেন। তৃতীয় বারে বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তুমি নিজ হাতে উহা পাল্লায় রাখিবে। আবার সেই হাত নিজের শরীরে বুলাইয়া লইবে, যদ্দরুন এই পরিমাণ আমার অংশে বেশী হইবে।

ফায়দা ঃ ইহা ছিল তাহার চরম পরহেজগারী এবং নিজকে অপবাদ হইতে মুক্ত রাখার জন্য তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। নচেৎ যে কেহ মাপিবে তাহার হাতে কিছু না কিছু লাগিবেই। এইজন্য উহা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। তথাপি হযরত ওমর (রাযিঃ) আপন স্ত্রীর ব্যাপারে ইহা পছন্দ করেন নাই। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) যাহাকে দ্বিতীয় ওমরও বলা হয়, তাহার যমানায় একবার মেশক ওজন করা হইতেছিল, তখন তিনি নাক বন্ধ করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, খোশবূ গ্রহণই মেশকের উদ্দেশ্য। (এহ্‌ইয়া) ইহাই ছিল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও আমাদের বুযর্গানে দ্বীনের সতর্কতা ও পরহেজগারী।

(১০) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয কর্তৃক হাজ্জাজের গভর্নরকে গভর্নর নিযুক্ত না করা

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এক ব্যক্তিকে কোন এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। কেহ বলিল, এই ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামলে তাহার পক্ষ হইতেও গভর্নর ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) সেই গভর্নরকে বরখাস্ত করিয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, আমি তো হাজ্জাজের শাসনামলে অল্প কয়েক দিন মাত্র কাজ করিয়াছি। ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলিলেন, খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি তাহার সাহচর্যে একদিন বা উহার চাইতেও কম সময় থাকিয়াছ। (এহ্‌ইয়া)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ সঙ্গে থাকার প্রভাব অবশ্যই পড়ে। যে ব্যক্তি মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকে তাহার উপর অস্বাভাবিকরূপে ও অজ্ঞাতসারে

তাকওয়ার প্রভাব পড়ে। আর যে ব্যক্তি ফাসেকদের সঙ্গে থাকে তাহার উপর নাফরমানীর প্রভাব পড়ে। এই কারণেই খারাপ সঙ্গ হইতে বাধা দেওয়া হয়। মানুষ তো দূরের কথা, সঙ্গে থাকার কারণে জানোয়ারেরও প্রভাব পড়ে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, উট ও ঘোড়াওয়ালাদের মধ্যে অহংকার থাকে এবং বকরীওয়ালাদের মধ্যে নম্রতা থাকে। (বুখারী)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যে, নেককার লোকের সঙ্গে উপবেশনকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে মেশকওয়ালার পাশে বসিয়া আছে, মেশক যদি নাও মিলে তবুও উহার খুশবুতে মস্তিষ্ক সতেজ হইবে। আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত আগুনের চুল্লিওয়ালার মত যদি স্ফুলিঙ্গ নাও পড়ে ধোঁয়া তো অবশ্যই লাগিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নামাযের প্রতি শওক ও আগ্রহ এবং উহাতে খুশু-খজু

নামায সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। কেয়ামতের দিন ঈমানের পরে সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কুফর ও ইসলামের মধ্যে নামাযই অন্তরায়। ইহা ছাড়াও এই সম্বন্ধে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো বহু এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যাহা আমার অন্য একটি পুস্তিকায় (ফাযায়েলে নামাযে) উল্লেখ করিয়াছি।

(১) নফল আদায়কারীদের সম্বন্ধে আল্লাহর বাণী

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমার পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। ফরয ব্যতীত অন্য কোন এবাদত দ্বারা বান্দা আমার অধিক নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা আমার নৈকট্য লাভ হয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে। আর নফল আদায় করার দ্বারা বান্দা আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে এমনকি আমি তাহাকে আমার প্রিয় বানাইয়া লই। অতঃপর আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে এবং তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে কোন বস্তু ধরে, আর তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার

নিকট কোন কিছু চায় তবে আমি দান করি আর যদি কোন কিছু হইতে আশ্রয় চায় তবে আমি আশ্রয় দান করি। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ চক্ষু, কান ইত্যাদি হওয়ার অর্থ এই যে, তাহার দেখাশুনা এবং চলাফেরা সবকিছু আমার মর্জি মোতাবেক হয় ; কোন কাজই আমার মর্জি ও সন্তুষ্টির খেলাফ হয় না। কতই না সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদের ফরয আদায়ের পর অধিক পরিমাণে নফল আদায় করার তৌফীক লাভ হয়, যদ্দরুন এই দৌলত নসীব হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে আমাকে এবং আমার বন্ধুদেরকেও এই সৌভাগ্য নসীব করুন।

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা রাত্র নামায আদায় করা

এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখিয়া থাকিলে বর্ণনা করুন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ বিষয় আশ্চর্যজনক ছিল না ; তাঁহার প্রত্যেকটি বিষয়ই তো আশ্চর্যজনক ছিল। একদিন রাত্রে তশরীফ আনিলেন এবং আমার নিকট শুইলেন। কিছুক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন, ছাড় আমি তো আপন রবের এবাদত করিব। এই বলিয়া তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সীনা মোবারক ভিজিয়া গেল। অতঃপর রুকু করিলেন। উহাতেও এইভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। তারপর সেজদা করিলেন। উহাতেও অনুরূপভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন, উহাতেও অনুরূপভাবে কাঁদিতে থাকিলেন। এইভাবে ফজর পর্যন্ত এবাদতে মশগুল থাকিলেন। ফজরের সময় হযরত বিলাল (রাযিঃ) আসিয়া নামাযের জন্য আওয়াজ দিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত কাঁদিতেছেন অথচ আপনি নিষ্পাপ ; আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত গোনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি এইরূপ করিব না কেন অথচ আজ আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল হইয়াছে— إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ, নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির আবর্তন বিবর্তনে

জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

আরো বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে এত দীর্ঘ নামায পড়িতেন যে, দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে পা ফুলিয়া যাইত। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত কষ্ট করেন? অথচ আপনাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? (বুখারী)

(৩) হুযূর (সঃ)এর চার রাকাতে ছয় পারা তেলাওয়াত করা

হযরত আওফ (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি সফরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। তিনি মিসওয়াক এবং ওজু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। আমিও তাঁহার সাথে নামাযে শরীক হইয়া গেলাম। তিনি এক রাকাতে সূরায়ে বাকারা তেলাওয়াত করিলেন। আর যখন রহমতের আয়াত আসিত তখন দীর্ঘসময় পর্যন্ত রহমতের দোয়া করিতে থাকিতেন। আর যখন আযাবের আয়াত আসিত দীর্ঘসময় পর্যন্ত আযাব হইতে পানাহ চাহিতেন। সূরা শেষ করিয়া রুকুতে গেলেন। রুকুতে ঐ পরিমাণ দেরী করিলেন যে পরিমাণ সময়ে সূরায়ে বাকারা পড়া যায়। রুকুতে سُبْحَانَ ذِىْ الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْعَظَمَةِ পড়িতেছিলেন। অতঃপর সেজদাও ঐ পরিমাণ দীর্ঘ করিলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে একই নিয়মে সূরায়ে আলি ইমরান তেলাওয়াত করিলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক রাকাতে এক এক সূরা তেলাওয়াত করিতে থাকিলেন। এইভাবে চার রাকাতে সোয়া ছয় পারা হয়। ইহা কত দীর্ঘ নামায হইবে যাহাতে প্রত্যেক রহমাতের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতে দীর্ঘসময় পর্যন্ত দোয়া করা হয়। আবার রুকু সেজদাও সেই পরিমাণ দীর্ঘ করা হইয়া থাকে।

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ নামায পড়া সম্পর্কিত নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, চার রাকাতে চার সূরা অর্থাৎ সূরায়ে বাকারা হইতে সূরায়ে মায়েদার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ উক্ত চার সূরা সোয়া ছয় পারা হয় যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাতে তেলাওয়াত করিয়াছেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজবীদ ও তারতীলের সহিত তেলাওয়াত করিতেন, যেমন অধিকাংশ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক রহমতের আয়াতে ও আযাবের আয়াতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোয়া করিতেন এবং অনুরূপভাবে রুকু সেজদাও দীর্ঘ করিতেন। ইহাতে অনুমান করা যায়

যে, এইভাবে চার রাকাতে কি পরিমাণ সময় লাগিয়াছে। কখনও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাতে সূরায়ে বাকারা, আলি ইমরান ও মায়েদা তেলাওয়াত করিয়াছেন যাহা প্রায় পাঁচ পারা। এইরূপ তখনই সম্ভব যখন নামাযের মধ্যে প্রশান্তি এবং চোখের শীতলতা লাভ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁহার অনুসরণের তৌফীক দান করুন।

(৪) হযরত আবু বকর, হযরত ইবনে যুবাইর ও হযরত আলী (রাযিঃ) ও অন্যান্যদের নামাযের অবস্থা

মুজাহিদ (রহঃ) হযরত আবু বকর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর অবস্থা বর্ণনা করেন যে, যখন তাহারা নামাযে দাঁড়াইতেন তখন এইরূপ মনে হইত যেন একটি কাষ্ঠখণ্ড মাটিতে গাড়া রহিয়াছে। অর্থাৎ, কোন প্রকার নড়াচড়া করিতেন না। (তারীখুল খোলাফা)

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে নামায শিখিয়াছেন আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অর্থাৎ যেভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেন ঠিক সেভাবে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নামায পড়িতেন। আর একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) নামায পড়িতেন। ছাবেত (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর নামায এমন হইত যেন কোন স্থানে একটি কাঠ পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে।

এক ব্যক্তি বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) যখন সিজদা করিতেন তখন এত দীর্ঘ এবং এত শান্ত ও অবিচল অবস্থায় সেজদা করিতেন যে, তাঁহার পিঠে পাখি আসিয়া বসিয়া যাইত। কখনও এত দীর্ঘ রুকু করিতেন যে, সমস্ত রাত্রি সকাল পর্যন্ত রুকুতেই কাটাইয়া দিতেন। কখনও সেজদা এতই দীর্ঘ হইত যে, সারা রাত্রি কাটিয়া যাইত। যখন হযরত ইবনে যুবাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন একবার একটি গোলা আসিয়া মসজিদের দেওয়ালের একটি অংশ উড়াইয়া লইয়া গেল। যাহা তাঁহার দাড়ি এবং গলদেশের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া গেল। এতদসত্ত্বেও না তিনি বিচলিত হইলেন আর না রুকু সেজদা সংক্ষেপ করিলেন।

একবার তিনি নামাযরত ছিলেন। তাঁহার ছেলে হাশেম নিকটেই

ঘুমাইতেছিল। ছাদ হইতে একটি সাপ পড়িয়া তাহার শরীরে জড়াইয়া গেল। সে চিৎকার করিলে বাড়ীর সমস্ত লোকজন দৌড়িয়া আসিল এবং হ গোল শুরু হইয়া গেল। অতঃপর সাপটিকে মারিয়া ফেলা হইল কিন্তু হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) একাগ্রচিত্তে নামায পড়িতে থাকিলেন। সালাম ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন কিছু শোরগোল শুনিতে পাইলাম কি হইয়াছিল? স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, ছেলে তো মারাই যাইতেছিল আর আপনার কোন খবরই নাই! তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার সর্বনাশ হউক! নামাযের মধ্যে অন্যদিকে মনোযোগ দিলে কি উহা নামায থাকিত?

হযরত ওমর (রাযিঃ)কে জীবনের শেষ সময়ে যখন খঞ্জর মারা হইল যাহার ফলে তিনি ইন্তেকাল করিলেন তখন সারাক্ষণ রক্তক্ষরণ হইত। অধিকাংশ সময় বেহুঁশও হইয়া যাইতেন। কিন্তু এই অবস্থায়ও যখন নামাযের ব্যাপারে সতর্ক করা হইত তখন ঐ অবস্থায় নামায আদায় করিয়া নিতেন। তিনি বলিতেন, ইসলামে ঐ ব্যক্তির কোন অংশ নাই যে নামায ছাড়িয়া দেয়। হযরত উছমান (রাযিঃ) সারারাত্র জাগিতেন, এক রাকাতে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করিতেন। (মুন্তাখাব কান্‌যুল উম্মাল)

হযরত আলী (রাযিঃ)এর অভ্যাস ছিল, যখন নামাযের ওয়াক্ত হইত তখন তাঁহার শরীরে কম্পন আসিয়া যাইত এবং চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সেই আমানত আদায়ের সময় হইয়াছে যাহা আল্লাহ তায়ালা আসমান–যমীন এবং পাহাড়–পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন কিন্তু উহারা এই আমানত গ্রহণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে আর আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি।

খলফ ইবনে আইয়ুব (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, নামাযের সময় আপনাকে মাছি বিরক্ত করে না? উত্তরে তিনি বলিলেন, ফাসেক লোকরা হুকুমতের বেত্রাঘাত সহ্য করে এবং কোন প্রকার নড়াচড়া করে না বরং গর্ব করে, আর নিজের ধৈর্য ও সবরের বাহাদুরী দেখায় যে, আমাকে এতগুলি বেত্রাঘাত করা হইয়াছে আমি একটুও নড়ি নাই। আর আমি আপন রবের সামনে দণ্ডায়মান হইয়াছি আর সামান্য মাছির কারণে নড়াচড়া করিব?

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইতেন তখন ঘরের লোকজনকে বলিতেন, তোমরা কথাবার্তা বলিতে থাক, তোমাদের কথাবার্তায় আমার কোন খবরই থাকিবে না। একবার তিনি বসরার জামে মসজিদে নামায আদায় করিতেছিলেন। মসজিদের একটি অংশ ধসিয়া

পড়িল। লোকজন দৌড়াইয়া সেখানে জমা হইল। শোরগোল হইল কিন্তু তিনি কিছুই টের পাইলেন না।।

হাতেম আসাম্ম (রহঃ)এর নিকট কেহ তাঁহার নামাযের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, যখন নামাযের সময় হয় তখন অজু করিয়া নামাযের জায়গায় যাইয়া কিছুক্ষণ বসি যাহাতে সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ শান্ত হইয়া যায়। অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়াই। এই ধ্যান করি যে, কাবা শরীফ আমার সামনে, পুলসিরাত আমার পায়ের নীচে, ডান দিকে জান্নাত, বামদিকে জাহান্নাম আর মালাকুল–মউত আমার পিছনে দাঁড়ানো। আর মনে করি যে, ইহাই আমার জীবনের শেষ নামায। অতঃপর পূর্ণ একাগ্রতার সহিত নামায পড়ি। অতঃপর আশা ও ভয়ের মাঝে থাকি, কারণ জানিনা আমার নামায কবুল হইল কিনা। (এহ্ইয়া)

⑤ জনৈক মুহাজির ও আনসারীর পাহারাদারী এবং আনসারী ব্যক্তির নামাযে তীরবিদ্ধ হওয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জেহাদ হইতে ফিরিবার সময় এক স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন এবং বলিলেন, আজ রাত্রে কে আমাদের পাহারা দিবে? একজন মুহাজির আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) এবং একজন আনসারী আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা পাহারা দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই পথ দিয়া শত্রুর আগমনের সম্ভাবনা ছিল সেই দিকের একটি পাহাড় দেখাইয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর। উভয় সেখানে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর আনসারী সাহাবী মুহাজিরকে বলিলেন, রাত্রিকে দুই ভাগ করিয়া একভাগে আপনি ঘুমাইবেন আর আমি জাগ্রত থাকিব আরেকভাগে আপনি জাগ্রত থাকিবেন আর আমি ঘুমাইব। কেননা, উভয়ই সারারাত্র জাগ্রত থাকিলে হইতে পারে কোন এক সময় উভয়েরই ঘুম আসিয়া যাইবে। জাগ্রত ব্যক্তি যদি কোন আশঙ্কা বোধ করে তবে আপন সঙ্গীকে জাগাইবে।

রাত্রের প্রথম ভাগে আনসারী সাহাবীর জাগ্রত থাকিবার সিদ্ধান্ত হইল। মুহাজির ঘুমাইয়া পড়িলেন। আনসারী সাহাবী নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি আসিয়া দূর হইতে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। কোন প্রকার নড়াচড়া না দেখিয়া দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। এইভাবে সে তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। প্রতিটি তীর আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হইতে থাকিল আর তিনি উহা হাত দ্বারা শরীর হইতে বাহির

করিয়া ফেলিয়া দিতে থাকিলেন।

অতঃপর তিনি ধীরস্থিরভাবে রুকু সেজদা করিলেন এবং নামায শেষ করিয়া সঙ্গীকে জাগাইলেন। শত্রুপক্ষের লোকটি একজনের স্থলে দুইজনকে দেখিতে পাইয়া মনে করিল নাজানি আরো কি পরিমাণ লোক রহিয়াছে তাই সে ভাগিয়া গেল। মুহাজির সঙ্গী জাগ্রত হইয়া দেখিলেন আনসারীর শরীরের তিন স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরিতেছে। তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি শুরুতেই আমাকে জাগাইলেন না কেন? আনসারী বলিলেন, আমি নামাযে একটি সূরা (সূরায়ে কাহ্‌ফ) শুরু করিয়াছিলাম। সূরাটি শেষ না করিয়া রুকুতে যাইতে মনে চাহিল না। এখন আমার এই ব্যাপারে ভয় হইল যে, এমন না হয় যে, বারবার তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে আমি মৃত্যুবরণ করি আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহারার যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যদি আমার এই আশঙ্কা না হইত তবে আমি মৃত্যুবরণ করিতাম কিন্তু সূরা শেষ না করিয়া রুকু করিতাম না। (বাইহাকী, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এই ছিল ঐ সমস্ত বুযুর্গ ব্যক্তির নামায এবং উহার প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ। তীরের পর তীর খাইতেছেন আর রক্তে রঞ্জিত হইতেছেন কিন্তু নামাযের স্বাদে কোন রকম ব্যতিক্রম হইতেছে না। আর আমাদের নামায এইরূপ যে, যদি মশাও কামড় দেয় তবে নামাযের ধ্যান ছুটিয়া যায়। আর ভিমরুলের কথা তো বাদই দিলাম।

এখানে ফেকাহ সম্পর্কিত একটি বিতর্কিত মাসআলা আছে। আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর মতে রক্ত বাহির হইলে অযু ভঙ্গ হইয়া যায় আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর মতে অযু ভঙ্গ হয় না। সম্ভবতঃ ঐ সাহাবীর অভিমতও ইহাই ছিল অথবা তখন পর্যন্ত এই মাসআলার তাহ্‌কীক হয় নাই ; কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। অথবা তখন পর্যন্ত এই হুকুম নাযিলই হয় নাই।

(৬) হযরত আবু তালহা (রাযিঃ)এর নামাযে অন্য ধ্যান আসিয়া যাওয়ার কারণে বাগান ওয়াক্‌ফ করা

হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ) একবার নিজ বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। একটি পাখি উড়িতে লাগিল। কিন্তু ঘন বাগানের কারণে পাখিটি বাহির হওয়ার পথ না পাইয়া কখনও এইদিকে কখনও ঐদিকে উড়িতে থাকিল এবং বহির হওয়ার পথ তালাশ করিতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টি উহার উপর পড়িল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ঐ দিকে ধ্যান চলিয়া

গেল এবং পাখির সাথে তাঁহার দৃষ্টিও এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকিল। হঠাৎ নামাযের ধ্যান ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কোন্ রাকাত পড়িতেছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। অত্যন্ত দুঃখ হইল যে, এই বাগানের কারণেই এই মুসীবত আসিয়াছে যে, নামাযে ভুল হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, যেহেতু এই বাগানের কারণে আমি এই মুসীবতে পড়িয়াছি, তাই এই বাগান আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিলাম। আপনি যেখানে ইচ্ছা উহা খরচ করিতে পারেন।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলে ঘটিয়াছিল। এক আনসারী সাহাবী নিজ বাগানে নামায আদায় করিতেছিলেন। খেজুর পাকার ভরা মৌসুম ছিল। অধিক খেজুরের ভারে কাঁদিগুলি ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। কাঁদিগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়িল খেজুরে ভরা হওয়ার কারণে খুবই ভাল লাগিল। ঐদিকে ধ্যান চলিয়া গেল। ফলে নামায কত রাকাত পড়িয়াছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। ইহাতে এত বেশী দুঃখ ও অনুতাপ হইল যে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাগানের কারণে এই মুসীবতের সম্মুখীন হইয়াছি সেই বাগানই আর রাখিব না। অতঃপর হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই বাগান আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে চাই ; আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তিনি সেই বাগান পঞ্চাশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া উক্ত মূল্য দ্বীনি কাজে ব্যয় করিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

ফায়দা ঃ ইহা হইতেছে ঈমানী মর্যাদাবোধ যে, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ এবাদতে ধ্যান ছুটিয়া যাওয়ার দরুন পঞ্চাশ হাজার দেরহাম মূল্যের একটি বাগান সঙ্গে সঙ্গে দান করিয়া দিলেন।

শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) 'কওলে জামীল' নামক কিতাবে সুফিয়ায়ে কেরামের নিসবতের (অর্থাৎ আল্লাহর সহিত সম্পর্কের) প্রকারভেদ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, এই নিসবত বা সম্পর্ক হইতেছে আল্লাহর এবাদতকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং অন্তরে ইহার মর্যাদা অনুভব করা। এই সমস্ত বুযর্গের এই কথার উপর ঈমানী মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হইল যে, আল্লাহর এবাদতের সময় অন্যদিকে ধ্যান কেন গেল?

(৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর নামাযের কারণে চক্ষুর চিকিৎসা না করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর চোখে যখন পানি আসিয়া গেল,

তখন চিকিৎসকরা আসিয়া বলিল, অনুমতি দিলে আমরা আপনার চোখের চিকিৎসা করিয়া দিব। তবে পাঁচ দিন একটু সতর্ক থাকিতে হইবে ; মাটিতে সেজদা না করিয়া কোন উঁচু কাঠের উপর সেজদা করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমি এক রাকাতও এইভাবে পড়িতে রাজি নই। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আমার জানা আছে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এক ওয়াক্ত নামাযও ছাড়িয়া দিবে সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ যদিও উযর বশতঃ এইভাবে নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে এবং ইহা নামায ত্যাগ করার মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অন্তরে নামাযের প্রতি যে মহব্বত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক আমল করার প্রতি যেরূপ গুরুত্ব ছিল উহার কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) চোখের চিকিৎসায় সম্মত হন নাই। তাঁহাদের কাছে সমস্ত দুনিয়া এক নামাযের মোকাবিলায় তুচ্ছ ছিল। আজ আমরা নির্লজ্জতার সহিত এই সকল জীবন উৎসর্গকারীদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া ফেলি কিন্তু কাল হাশরের ময়দানে যখন তাহাদের সম্মুখীন হইব আর এই আত্মত্যাগী ব্যক্তিগণ ময়দানে হাশরের আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন তখন হাকীকত বুঝে আসিবে যে, তাঁহারা কি ছিলেন আর আমরা তাঁহাদের সাথে কিরূপ আচরণ করিয়াছি।

(৮) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) একবার বাজারে ছিলেন। জামাতের সময় হইয়া গেলে তিনি দেখিলেন যে, সাথে সাথে সকলেই নিজ নিজ দোকান বন্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এই সমস্ত লোক সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হইয়াছে— رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

সম্পূর্ণ আয়াতের তরজমা হইল—

“এই সকল মসজিদে এমন সমস্ত লোক সকাল–সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাহাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিশেষ করিয়া নামায আদায় ও যাকাত প্রদান হইতে বেচাকেনা গাফেল করিতে পারে

না। তাহারা এমন দিনের পাকড়াওকে ভয় করেন যেদিন বহু অন্তর ও চক্ষু উলট–পালট হইয়া যাইবে।” (বয়ানুল কুরআন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তাহারা ব্যবসা–বাণিজ্য ও নিজেদের কাজকর্মে লিপ্ত হইতেন বটে কিন্তু যখন আযানের আওয়াজ শুনিতেন তখন সবকিছু ছাড়িয়া সাথে সাথে মসজিদে চলিয়া যাইতেন। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম ! এই সমস্ত লোক ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তাহাদের ব্যবসা তাহাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখিতে পারিত না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) একবার বাজারে ছিলেন। লোকজনকে দেখিলেন আযানের সাথে সাথে নিজ নিজ সামানপত্র রাখিয়া নামাযের দিকে রওয়ানা হইয়া গেল। ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলিলেন, ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াত দ্বারা স্মরণ করিয়াছেন।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র জগতের মখলুককে এক জায়গায় একত্র করিবেন তখন বলিবেন, ঐ সমস্ত লোক কোথায় যাহারা সুখ–দুঃখ উভয় অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করিত? তখন একটি ছোট্ট দল উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং বিনা হিসাব কিতাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। পুনরায় বলিবেন, ঐ সমস্ত লোক কোথায় যাহারা রাত্রে জাগ্রত থাকিত এবং ভয় ও আগ্রহের সহিত আপন রবকে স্মরণ করিত? তখন আরেকটি ছোট্ট দল উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং বিনা হিসাব কিতাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আবার বলিবেন, ঐ সমস্ত লোক কোথায় যাহাদেরকে তাহাদের ব্যবসা–বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখিত না? তখন তৃতীয় আরেকটি ছোট্ট দল উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর অবশিষ্ট লোকদের হিসাব শুরু হইবে। (দুররে মানসূর)

(৯) হযরত খুবাইব (রাযিঃ)এর কতল হওয়ার সময় নামায পড়া ঃ হযরত যায়েদ (রাযিঃ) ও হযরত আসেম (রাযিঃ)এর কতল

উহুদের যুদ্ধে যে সমস্ত কাফের নিহত হইয়াছিল তাহাদের আত্মীয়–স্বজনের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুলাফার দুই পুত্রও ঐ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তাই সে মান্নত

করিয়াছিল, যদি আসেমের মাথা হাতে পাই তবে তাহার মাথার খুলিতে শরাব পান করিব। (কারণ, আসেমই তাহার পুত্রদেরকে হত্যা করিয়াছিল) তাই সে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, যে ব্যক্তি আসেমের মাথা আনিয়া দিবে তাহাকে একশত উট পুরস্কার দিব।

সুফিয়ান ইবনে খালেদ নামক জনৈক কাফের এই পুরস্কারের লোভে পড়িয়া তাঁহার মাথা আনিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। সুতরাং আদল এবং কারা গোত্রের কতিপয় লোককে সে মদীনায় পাঠাইল। তাহারা মদীনায় আসিয়া নিজেদেরকে মুসলমান প্রকাশ করিল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাহাদের সঙ্গে কিছু লোক তালীম ও তবলীগের জন্য পাঠইবার আবেদন জানাইল। হযরত আসেমকেও সাথে পাঠাইবার আবেদন জানাইল। কারণ স্বরূপ তাহার ওয়াজ–নসীহত খুবই পছন্দনীয় বলিয়া উল্লেখ করিল। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজন সাহাবীকে কোন বর্ণনা মতে ছয়জন সাহাবীকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে হযরত আসেম (রাযিঃ)ও ছিলেন। পথিমধ্যে ইহারা তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং মোকাবিলার জন্য শত্রুদেরকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা দুইশত লোক ছিল, তন্মধ্যে একশতজন ছিল বিখ্যাত তীরন্দাজ। কোন কোন বর্ণনামতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে মক্কাবাসীদের খবর নেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে বনি লেহইয়ানের দুইশত লোকের সহিত মোকাবিলা হয়। দশজন বা ছয়জনের এই ক্ষুদ্র দলটি এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখিয়া ফাদফাদ নামক এক পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাফেররা বলিল, আমরা তোমাদের রক্তে আমাদের মাটি রঞ্জিত করিতে চাই না। আমরা কেবল তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের নিকট হইতে কিছু অর্থ আদায় করিতে চাই। তোমরা আমাদের সাথে আস। আমরা তোমাদেরকে হত্যা করিব না। কিন্তু মুসলমানেরা বলিল, আমরা কাফেরের চুক্তিতে আসিতে চাই না এবং তীরদান হইতে তীর বাহির করিয়া তাহাদের সাথে মোকাবিলা করিলেন। যখন তীর ফুরাইয়া গেল, বর্শা দ্বারা মোকাবিলা করিলেন। হযরত আসেম (রাযিঃ) সঙ্গীদেরকে জোশের সহিত বলিলেন, তোমাদের সহিত প্রতারণা করা হইয়াছে। তবে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই। শাহাদাতকে গনীমত মনে কর। তোমাদের মাহবুব (প্রেমাস্পদ) তোমাদের সঙ্গেই আছেন আর জান্নাতের হুরগণ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই বলিয়া পূর্ণ উদ্যমে তিনি শত্রুর মোকাবিলা করিলেন। যখন বর্শাও ভাঙ্গিয়া গেল তখন তরবারী দ্বারা

মোকাবিলা করিলেন। শত্রু পক্ষের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করিলেন এবং এই দোয়া করিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের এই সংবাদ আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছাইয়া দিন। তাঁহার এই দোয়া কবুল হইল এবং ঐ মুহূর্তেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হইয়া গেলেন। যেহেতু হযরত আসেম (রাযিঃ) শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, সুলাফা তাহার মাথার খুলিতে শরাব পান করার মান্নত করিয়াছে তাই তিনি মৃত্যুর সময় দোয়া করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় আমার শিরোশ্ছেদ করা হইতেছে তুমিই উহার হেফাজতকারী। এই দোয়াও কবুল হইল। শাহাদাতের পর কাফেররা যখন তাঁহার মাথা কাটিতে আসিল তখন আল্লাহ তায়ালা এক ঝাঁক মৌমাছি কোন বর্ণনা মতে এক ঝাঁক ভীমরুল পাঠাইয়া দিলেন। উহারা তাঁহার শরীরকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইল। কাফেররা ভাবিয়াছিল রাত্রে যখন ইহারা চলিয়া যাইবে তখন তাঁহার মাথা কাটিয়া লইব। কিন্তু রাত্রে ভীষণ বৃষ্টির স্রোত আসিয়া তাঁহার লাশ ভাসাইয়া লইয়া গেল।

এইভাবে সাতজন অথবা তিনজন শহীদ হইয়া গেলেন। কেবল তিনজন জীবিত রহিলেন। তাঁহারা হইতেছেন, খুবাইব (রাযিঃ), যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাযিঃ)। কাফেরেরা এই তিনজনের সহিত পুনরায় অঙ্গীকার করিল যে, তোমরা নীচে আস। তোমাদের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না। ইহারা তিনজন তাহাদের ওয়াদা অনুসারে নীচে নামিয়া আসিলেন। নীচে নামিয়া আসার পর কাফেররা ধনুকের রশি খুলিয়া তাঁহাদের হাত বাঁধিয়া ফেলিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক বলিলেন, ইহা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আমি তোমাদের সাথে কখনও যাইব না। এই শহীদগণের অনুসরণই আমার কাছে পছন্দনীয়। কাফেররা তাঁহাকে জোরপূর্বক টানিয়া নিতে চাহিল কিন্তু তিনি অনড় রহিলেন। অবশেষে তাঁহারা তাঁহাকেও শহীদ করিয়া দিল। কেবল দুইজনকে তাহারা গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল এবং মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিল। একজন হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ) যাহাকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা তাহার পিতা উমাইয়ার পরিবর্তে হত্যা করিবার জন্য পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করিল আর হযরত খুবাইব (রাযিঃ)কে হুজাইর ইবনে আবি ইহা তাহার পিতার হত্যার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য একশত উটের বিনিময়ে খরিদ করিল। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী হারেছ ইবনে আমেরের সন্তানেরা তাহাকে খরিদ করিয়াছিল।

কেননা, তিনি হারেছকে বদরের যুদ্ধে কতল করিয়াছিলেন।

সাফওয়ান আপন কয়েদী হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ)কে তৎক্ষণাৎই হত্যা করিবার জন্য আপন গোলামের হাতে হরম শরীফের বাহিরে পাঠাইয়া দিল। তাঁহার হত্যাকাণ্ডের তামাশা দেখিবার জন্য বহু লোক সমবেত হয় তন্মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিলেন। তিনি হযরত যায়েদকে শহীদ করিয়া দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়েদ? তোমাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি সত্য সত্য বল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়, আর তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে তুমি আপন পরিবার পরিজন লইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতে পার। হযরত যায়েদ বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আছেন সেখানেই তাঁহার শরীরে একটি কাঁটা ফুটুক আর আমি নিজ ঘরে আরামে থাকি। কোরাইশরা এই উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। আবু সুফিয়ান বলিলেন, মুহাম্মদের প্রতি তাঁহার সাথীদের যে ভালবাসা দেখিয়াছি উহার নজীর আমি আর কোথাও দেখি নাই। অতঃপর হযরত যায়েদকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইল।

হযরত খুবাইব (রাযিঃ) কিছুকাল বন্দী অবস্থায় থাকেন। হুজাইরের বাঁদী যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, খুবাইব (রাযিঃ) যখন আমাদের কাছে বন্দী অবস্থায় ছিলেন তখন একদিন তাহার হাতে মানুষের মাথা সমান বড় একটি আঙ্গুর ছড়া দেখিলাম তিনি উহা হইতে আঙ্গুর খাইতেছেন। অথচ মক্কায় তখন কোন আঙ্গুর ছিল না। তিনি বলেন—যখন তাহার কতলের সময় ঘনাইয়া আসিল তখন তিনি সাফাই করার জন্য একটি ক্ষুর চাহিলেন। তাহাকে একটি ক্ষুর দেওয়া হইল। ঘটনাক্রমে একটি ছোট্ট শিশু খোবাইবের নিকট চলিয়া গেল। লোকজন তাহার হাতে ক্ষুর এবং পাশে ছোট্ট শিশুকে দেখিয়া খুব চিন্তিত হইল। খুবাইব (রাযিঃ) বলিলেন, তোমরা মনে করিতেছ আমি শিশুটিকে হত্যা করিয়া ফেলিব। এইরূপ কখনও করিব না। অতঃপর তাঁহাকে হরম শরীফের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। শূলিতে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার যদি কোন আকাঙ্খা থাকে তবে বল। তিনি বলিলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায আদায়ের সুযোগ দেওয়া হউক। কারণ, ইহা দুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়ার সময় এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নিকটবর্তী। তাহাকে নামাযের

সুযোগ দেওয়া হইল। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা যদি ইহা মনে না করিতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করিতেছি তবে আরো দুই রাকাত নামায পড়িতাম। অতঃপর যখন তাঁহাকে শূলে চড়ানো হইল তখন দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার আখেরী সালাম পৌছাইবে। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁহার সালাম পৌছাইয়া দেওয়া হইল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম হে খুবাইব! তারপর সাহাবীগণকে কোরাইশ কর্তৃক হযরত খুবাইবের কতল করিয়া দেওয়ার সংবাদ জানাইলেন।

হযরত খুবাইবকে যখন শূলিতে চড়ানো হইল তখন চল্লিশজন লোক চারিদিক হইতে তাঁহাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিল এবং তাঁহার দেহকে চালনীর মত ঝাঁঝরা করিয়া দিল। ঐ মুহূর্তে কেহ তাঁহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করা হউক আর তোমাকে মুক্তি দেওয়া হউক? উত্তরে তিনি বলিলেন, মহান আল্লাহর কসম, আমার প্রাণের বিনিময়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাটা বিদ্ধ হইবেন—আমি ইহাও পছন্দ করি না। (ফাতহুল বারী, ইসলাম)

ফায়দা ঃ এমনি তো এই সমস্ত ঘটনার প্রতিটি শব্দই উপদেশমূলক কিন্তু এই ঘটনায় দুইটি বিষয় বিশেষভাবে উপদেশমূলক এবং অতি মূল্যবান। তন্মধ্যে একটি হইল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর মহব্বত ও ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত কিন্তু উহার পরিবর্তে এতটুকু শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতেও প্রস্তুত নহেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন প্রকার সাধারণ কষ্টও দেওয়া হোক। কেননা, তাঁহারা হযরত খুবাইব (রাযিঃ) দ্বারা কেবল মৌখিকই বলাইতে চাহিয়াছিল এবং শুধু মুখে বলিলেই হইত। অন্যথা বদলা স্বরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার শক্তি কাফেরদের ছিল না। বরং তাহারা নিজেরাই সর্বদা কষ্ট দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকিত। কাজেই বদলা লওয়া না লওয়া তো বরাবর ছিল। দ্বিতীয় বিষয় হইল, নামাযের প্রতি তাঁহাদের মর্যাদা ও মহব্বত। এমন অন্তিম মুহূর্তে সাধারণতঃ মানুষ স্ত্রী-সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া থাকে।

তাহাদেরকে এক নজর দেখিতে চায়, তাহাদের কাছে সালাম ও খবর পৌঁছায়। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিদের সালাম ও খবর ছিল হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এবং আখেরী বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল দুই রাকাত নামায।

(১০) জান্নাতে হুযূর (সঃ)এর সঙ্গ লাভের জন্য নামাযের সাহায্য

হযরত রবীয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রাত্রি যাপন করিতাম। তাহাজ্জুদের সময় অযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ যথা মিসওয়াক, জায়নামায ইত্যাদি রাখিতাম। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খেদমতে খুশী হইয়া বলিলেন, তোমার কি চাহিবার আছে চাও। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গলাভ করিতে চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কি চাও? বলিলেন, শুধু ইহাই আমার বাসনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে অধিক সেজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করিও। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ এখানে এই বিষয়ের উপর সতর্ক করা হইয়াছে যে, শুধু দোয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। বরং চেষ্টা ও আমলেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। আর আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে নামায। নামায যত বেশী পড়া হইবে সেজদাও তত বেশী হইবে। যাহারা এই ভরসা করিয়া বসিয়া থাকে যে, অমুক পীর বা অমুক বুযুর্গের মাধ্যমে দোয়া করাইয়া নিব, ইহা তাহাদের মারাত্মক ভুল। আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়াকে আসবাব ও উপকরণের মাধ্যমে চালাইয়াছেন। যদিও তিনি কোন আসবাব ও উপকরণ ছাড়াই প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং কুদরত জাহের করার জন্য কখনও এইরূপ করিয়াও থাকেন। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ইহাই যে, দুনিয়ার কাজ কারবারকে আসবাব ও উপকরণের সহিত লাগাইয়া রাখিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় হইল, আমরা দুনিয়ার কাজকর্মে তো তকদীর ও দোয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি না বরং সব ধরনের চেষ্টা চালাইয়া থাকি কিন্তু দ্বীনি কাজের মধ্যে তকদীর ও দোয়া মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহওয়ালাগণের দোয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহা বলিয়াছেন যে, বেশী বেশী সেজদার মাধ্যমে আমার দোয়ার ব্যাপারে সাহায্য করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আত্মত্যাগ, সহানুভূতি ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

ঈছার বা আত্মত্যাগ হইল নিজের প্রয়োজনের সময় অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রথম তো সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃএর প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি অভ্যাস এমন ছিল যে, উহার সমকক্ষতা তো দূরের কথা উহার কিঞ্চিৎও যদি কোন ব্যক্তির লাভ হইয়া যায় তবে উহা সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। তদুপরি কতিপয় চরিত্র এবং অভ্যাস এমন অনন্য ছিল যে, উহা কেবল তাঁহাদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তন্মধ্যে একটি ঈছার বা নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে উহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং এই আয়াতে উক্ত গুণের আলোচনা করিয়াছেন যে,

يُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ, তাহারা নিজেদের উপর অপরকে অগ্রাধিকার দান করে যদিও তাহারা ক্ষুধার্ত থাকে।

(১) এক সাহাবী (রাযিঃ)এর মেহমানের খাতিরে বাতি নিভাইয়া ফেলা

একজন সাহাবী হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ক্ষুধা ও পেরেশানীর অবস্থা জানাইলেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সকল ঘরে কাহাকেও পাঠাইলেন। কোন ঘরেই কিছু পাওয়া গেল না। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কেহ আছে কি? যে এক রাত্রির জন্য এই ব্যক্তির মেহমানদারী কবুল করিবে? এক আনসারী সাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মেহমানদারী করিব। তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন এবং আপন স্ত্রীকে বলিলেন, এই ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান। যতদূর সম্ভব তাহার মেহমানদারীতে কোনপ্রকার ত্রুটি করিবে না এবং কোন জিনিস লুকাইয়া রাখিবে না। স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম, বাচ্চাদের উপযোগী সামান্য খাবার ব্যতীত ঘরে আর কিছুই নাই। সাহাবী বলিলেন, বাচ্চাদেরকে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দাও এবং যখন তাহারা ঘুমাইয়া যাইবে তখন খানা লইয়া মেহমানের সহিত বসিয়া যাইব আর তুমি বাতি

ঠিক করার বাহানায় উঠিয়া উহা নিভাইয়া দিবে। সুতরাং স্ত্রী তাহাই করিল। স্বামী–স্ত্রী উভয়ে এবং বাচ্চারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি কাটাইল। এই প্রেক্ষিতেই আয়াত নাযিল হইল— يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ আয়াতের তরজমা—"আর তাহারা অন্যকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও তাহারা ক্ষুধার্ত থাকে।

(২) রোযাদারের জন্য বাতি নিভাইয়া দেওয়া

এক সাহাবী রোযার পর রোযা রাখিতেন। ইফতার করার জন্য খাওয়ার কোন কিছু জুটিত না। হযরত ছাবেত নামক এক আনসারী সাহাবী বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রাত্রে একজন মেহমান লইয়া আসিব। যখন খাওয়া আরম্ভ করিব তখন তুমি বাতি ঠিক করার ভান করিয়া নিভাইয়া দিবে। যতক্ষণ মেহমানের পেট না ভরিয়া যাইবে ততক্ষণ আমরা খাইব না। সুতরাং তাহারা এইরূপই করিলেন। মেহমানের সহিত শরীক রহিলেন, যেন খানা খাইতেছেন। সকালে হযরত ছাবেত (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির হইলে তিনি বলিলেন, রাত্রে মেহমানের সহিত তোমরা যে আচরণ করিয়াছ তাহা আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে।

(দুররে মানসূর)

(৩) জনৈক সাহাবীর যাকাতস্বরূপ উট প্রদান

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাতের মাল উসূল করিবার জন্য পাঠাইলেন। আমি একব্যক্তির নিকট যাইয়া তাহার মালের বিস্তারিত হিসাব লইলাম। ইহাতে তাহার উপর এক বছরের একটি উটের বাচ্চা ওয়াজিব হইল। আমি তাহার কাছে উহা চাহিলাম। সে বলিতে লাগিল, এক বছরের বাচ্চা দুধের কাজেও আসিবে না, সওয়ারীর কাজেও আসিবে না। সে একটি মূল্যবান সুন্দর শক্তিশালী উটনী আনিয়া হাজির করিল এবং বলিল, ইহা লইয়া যান। আমি বলিলাম, আমি তো ইহা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, আমার প্রতি উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিবার নির্দেশ নাই। হাঁ, যদি আপনি ইহাই দিতে চাহেন তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে আছেন আজ আপনার নিকটেই এক জায়গায় অবস্থান করিবেন তাঁহার খেদমতে যাইয়া পেশ করুন। তিনি যদি গ্রহণ করেন তবে আমার কোন আপত্তি নাই আর না হয় আমি অপারগ। সে উটনীসহ

আমার সহিত রওয়ানা হইল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিনিধি আমার কাছে যাকাতে মাল উসূল করিবার জন্য আসিয়াছিল। আল্লাহর কসম, আজ পর্যন্ত আমার এই সৌভাগ্য হয় নাই যে, আল্লাহর রাসূল অথবা তাঁহার কোন প্রতিনিধি আমার মাল গ্রহণ করিয়াছেন। তাই আমি সমস্ত মাল তাহার সামনে উপস্থিত করিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, ইহাতে এক বৎসরের একটি উটের বাচ্চা জাকাতস্বরূপ ওয়াজিব হইয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক বছরের বাচ্চা দুধের কাজেও আসিবে না, আরোহণের কাজেও আসিবে না। তাই আমি একটি সুন্দর শক্তিশালী উটনী তাহার সামনে পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য আমি স্বয়ং আপনার খেদমতে উহা লইয়া হাজির হইয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার উপর ওয়াজিব উহাই যাহা সে বলিয়াছে, তবে তুমি যদি উহার চাইতে উত্তম মাল নিজের পক্ষ হইতে দাও তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইহার সওয়াব দান করুন। সে উহা পেশ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করিলেন এবং তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন।

ফায়দা ঃ এই ছিল যাকাতের নমুনা। আজও ইসলামের বহু দাবীদার রহিয়াছে যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতেরও দাবী করিয়া থাকে কিন্তু যাকাত আদায়ে অতিরিক্ত দান করা তো দূরের কথা নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় করাও মৃত্যু সমতুল্য মনে করে। যাহারা বড়লোক ও ধনী পরিবার তাহাদের কাছে তো যাকাতের প্রায় আলোচনাই নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং যাহারা নিজেদেরকে দ্বীনদার বলিয়া মনে করে তাহারাও এই চেষ্টা করে যে, আত্মীয়–স্বজনের মধ্যে অথবা বাধ্য হইয়া অন্য কোন জায়গায় যদি খরচ করিতে হয় তবে উহাতেও যাকাতেরই নিয়ত করিয়া লয়।

(৪) হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাযিঃ)এর মধ্যে সদকা করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা

হযরত ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা করিবার আদেশ করিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় আমার কাছে কিছু মাল ছিল। আমি ভাবিলাম আজ আমার নিকট ঘটনাক্রমে মাল মওজুদ আছে। আমি যদি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর তুলনায় কখনও অগ্রগামী হইতে পারি তবে আজই পারিব। এই চিন্তা করিয়া আমি

আনন্দের সহিত ঘরে গেলাম এবং যেই পরিমাণ মাল ঘরে রাখা ছিল উহার অর্ধেক লইয়া আসিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবারবর্গের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, কি রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, অর্ধেক মাল রাখিয়া আসিয়াছি।

আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ঘরে যাহা ছিল সম্পূর্ণ লইয়া আসিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরওয়ালাদের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁহার পবিত্র রাসূলের নামের বরকত ও তাঁহাদের সন্তুষ্টি রাখিয়া আসিয়াছি। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হইতে কখনও অগ্রগামী হইতে পারিব না।

ফায়দা ঃ ভাল গুণ ও নেক কাজে অন্যের তুলনায় আগে বাড়িয়া যাওয়ার চেষ্টা করা খুবই প্রশংসনীয় কাজ। কুরআনে পাকেও এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ঘটনা তাবুকের যুদ্ধের সময় ঘটিয়াছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদা দানের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামর্থ্যের চাইতেও বেশী সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাঁহাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

(৫) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অপরের খাতিরে পিপাসায় মৃত্যুবরণ

হযরত আবু জাহম ইবনে হুযাইফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে আপন চাচাত ভাইয়ের তালাশে বাহির হইলাম। কেননা, তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সঙ্গে এক মশক পানি লইয়া গেলাম। যাহাতে পিপাসার্ত থাকিলে পান করাইতে পারি। ঘটনাক্রমে তাহাকে একস্থানে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম, তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ঢোক পানি দিব কি? সে ইশারায় হাঁ বলিল। এমন সময় তাঁহার নিকটবর্তী মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর পড়িয়া থাকা আর এক ব্যক্তি আহ্ করিয়া উঠিল। আমার চাচাত ভাই তাহার আওয়াজ শুনিয়া আমাকে তাহার নিকট যাওয়ার ইশারা করিল। আমি তাহার নিকট পানি লইয়া গেলাম। তিনি ছিলেন

হিশাম ইবনে আবিল আস। তাহার নিকট পৌছিবা মাত্রই মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর পড়িয়া থাকা তৃতীয় আরেক ব্যক্তি আহ্! করিয়া উঠিল। হেশাম আমাকে তাহার নিকট যাওয়ার জন্য ইশারা করিলেন। তাহার নিকট পৌছিয়া দেখি, তিনি আর ইহজগতে নাই। অতঃপর হিশামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ; তিনিও ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট আসিলাম ; ইত্যবসরে সেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। (দিরায়াহ্)

ফায়দা ঃ এই ধরনের বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত রহিয়াছে। এই আত্মত্যাগের কি কোন সীমা আছে যে, আপন ভাই মরণাপন্ন আর পিপাসায় কাতর এমতাবস্থায় অন্য কাহারও প্রতি লক্ষ্য করাই তো কঠিন ব্যাপার ; তদুপরি তাহাকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রাখিয়া অন্যকে পানি পান করাইবার জন্য চলিয়া যাওয়া। আল্লাহ এই সকল প্রাণ বিসর্জনকারীদের রূহকে অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করুন যাহারা মৃত্যুকালে যখন জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইয়া যায় তখনও অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাইয়া জীবন দান করেন।

(৬) হযরত হামযা (রাযিঃ)এর কাফন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা (রাযিঃ) উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। নিষ্ঠুর কাফেরেরা তাঁহার নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গসমূহ কাটিয়া ফেলে বুক চিরিয়া কলিজা বাহির করে এবং আরো বিভিন্ন ধরনের জুলুম করে যুদ্ধ শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য সাহাবীগণ শহীদদের লাশ খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় হযরত হামযা (রাযিঃ)কে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। একটি চাদর দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া দিলেন। ইতিমধ্যেই হযরত হামযা (রাযিঃ)এর সহোদরা বোন হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) আপন ভাইয়ের অবস্থা দেখিবার জন্য আসিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করিলেন, শত হইলেও মেয়ে মানুষ এই ধরনের জুলুমের দৃশ্য সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাই তাহার ছেলে যুবাইরকে বলিলেন, তুমি তোমার মাকে দেখিতে নিষেধ কর। যুবাইর (রাযিঃ) মায়ের নিকট আরজ করিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, আমার ভাইয়ের নাক-কান ইত্যাদি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা আল্লাহর রাস্তায় তেমন কোন বড়

বিষয় নহে। আমি ইহাতে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের আশা রাখি। ইনশাআল্লাহ সবর করিব। হযরত যুবাইর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া এই কথা শুনাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর শুনিয়া তাহাকে দেখিবার অনুমতি দিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং তাঁহার জন্য ইস্তেগফার ও দোয়া করিলেন।

এক রেওয়ায়াত অনুসারে উহুদের যুদ্ধে যেখানে লাশসমূহ রাখা হইয়াছিল, জনৈকা মহিলা ঐ দিকে দ্রুত আসিতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দেখ, মহিলাটিকে বাধা দাও। হযরত যুবাইর (রাযিঃ) বলেন, আমি চিনিয়া ফেলিলাম যে, তিনি আমার মা। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলাম, কিন্তু তিনি শক্তিশালী ছিলেন তাই আমাকে এক ঘুষি মারিয়া বলিলেন, সরিয়া যাও। আমি বলিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেলেন। অতঃপর দুইটি কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন, আমি এই দুইটি কাপড় আমার ভাইয়ের কাফনের জন্য আনিয়াছিলাম। কারণ, আমি তাহার ইন্তিকালের খবর শুনিতে পাইয়াছিলাম। এই কাপড়গুলিতে তাহাকে কাফন দিও। আমরা কাপড়গুগুলি লইয়া হযরত হামযা (রাযিঃ)কে কাফন দিতেছিলাম। পাশেই এক আনসারী শহীদের লাশ পড়িয়াছিল। তাহার নাম হযরত সুহাইল ছিল। হযরত হামযা (রাযিঃ)এর ন্যায় তাহাকেও কাফেররা ঐরূপ অবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের লজ্জা হইল যে, হযরত হামযা (রাযিঃ)কে দুই কাপড় দ্বারা কাফন দিব আর আনসারী সাহাবী একটি কাপড়ও পাইবেন না। তাই প্রত্যেককে এক একটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়ার সিদ্ধান্ত লওয়া হইল। কাপড় দুইটির মধ্যে একটি বড় ও অপরটি ছোট ছিল। আমরা লটারীর ব্যবস্থা করিলাম। লটারীর মাধ্যমে যাহার ভাগে যে কাপড় আসিবে উহা দ্বারাই তাহাকে কাফন দেওয়া হইবে। লটারীতে বড় কাপড়টি সুহাইল (রাযিঃ)এর অংশে আসিল আর ছোট কাপড়টি হযরত হামযা (রাযিঃ)এর অংশে আসিল। কাপড়টি তাঁহার দেহের তুলনায় খাট ছিল বিধায় মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত আর পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও আর পাতা ইত্যাদি দ্বারা পা ঢাকিয়া দাও।

(তারীখে খামীস)

ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা অনুসারে হযরত সাফিয়্যা (রাযিঃ) যখন দুইটি

কাপড় লইয়া হযরত হামযা (রাযিঃ)এর লাশের নিকট পৌছিলেন তখন তাঁহারই পাশে এক আনসারী সাহাবীর লাশ অনুরূপভাবে পড়িয়াছিল। অতএব উভয়কে এক এক কাপড়ে কাফন দেওয়া হইল এবং হযরত হামযা (রাযিঃ)এর কাপড়টি বড় ছিল। এই রেওয়ায়াতটি পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত আর পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতটি বিস্তারিত।

ফায়দা ঃ এই ছিল দোজাহানের বাদশার চাচার কাফন। তাহাও আবার এইভাবে যে, এক মহিলা আপন ভাইয়ের জন্য দুইটি কাপড় দিলেন। পাশে এক আনসারী সাহাবী কাফনবিহীন থাকিবে ইহাও বরদাশত হইতেছে না তাই প্রত্যেককে একটি করিয়া বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর ছোট কাপড়টি ঐ ব্যক্তির ভাগে পড়িল যিনি বহুদিক হইতে অগ্রগণ্য হওয়ার অধিকার রাখেন। গরীবের বন্ধু এবং সাম্যের দাবীদাররা যদি আপন দাবীতে সত্যবাদী হইয়া থাকে তবে যেন এই সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিদের অনুসরণ করে যাহারা শুধু মুখে নয় বরং কাজে পরিণত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদের নিজেদেরকে তাহাদের অনুসারী বলাও লজ্জার বিষয়।

(৭) বকরীর মাথা ঘুরিয়া ফেরত আসা

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবীকে এক ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা হাদিয়া দিল। তিনি ভাবিলেন যে, আমার অমুক সাথী অধিক অভাবগ্রস্ত, অনেক সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে এবং তাহার পরিবার বেশী অভাবী। অতএব তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহারাও তৃতীয় আরেক ব্যক্তির প্রতি অনুরূপ ধারণা করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে সাত ঘর ঘুরিয়া পুনরায় প্রথম সাহাবীর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ফায়দা ঃ উক্ত ঘটনা দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপকভাবে অভাবগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টিও বুঝা যায়। আর ইহাও জানা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট নিজের প্রয়োজন অপেক্ষা অন্যের প্রয়োজন অগ্রগণ্য মনে হইত।

(৮) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর আপন স্ত্রীকে ধাত্রীর কাজে লইয়া যাওয়া

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহার খেলাফতের যামানার অধিকাংশ রাত্রে চৌকিদারী স্বরূপ শহরের হেফাজতও করিতেন। এই

অবস্থায় একবার এক ময়দানের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। একটি পশমের তাঁবু খাটানো দেখিলেন যাহা পূর্বে সেখানে দেখেন নাই। তিনি নিকটে যাইয়া দেখিলেন একজন লোক সেখানে বসিয়া আছে আর তাঁবুর ভিতর হইতে কাতরানোর আওয়াজ আসিতেছে। তিনি সালাম করিয়া লোকটির নিকট বসিয়া গেলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি বলিল, আমি একজন বেদুঈন মুসাফির। আমীরুল মুমিনীনের নিকট কিছু প্রয়োজনের কথা বলিয়া সাহায্যের জন্য আসিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তাঁবু হইতে কিসের আওয়াজ আসিতেছে? লোকটি বলিল, মিয়া! যাও, তুমি নিজের কাজ কর। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন, মনে হইতেছে কোন কষ্টের আওয়াজ। লোকটি বলিল, আমার স্ত্রীর প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রসব ব্যথা হইতেছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সাথে অন্য কোন মহিলা আছে কি? লোকটি বলিল, কেহ নাই। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া সোজা ঘরে চলিয়া আসিলেন এবং নিজের স্ত্রী উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)কে বলিলেন, একটি বিরাট সওয়াবের কাজ তোমার ভাগ্যে আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, একা একজন বেদুঈন মহিলার প্রসব ব্যথা হইতেছে। স্ত্রী বলিলেন, হাঁ, হাঁ, আপনার অনুমতি হইলে আমি প্রস্তুত আছি। আর প্রস্তুত হইবেন না কেন? তিনিও তো হযরত ছাইয়্যেদা ফাতেমা (রাযিঃ)এর কন্যা ছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, প্রসবকালে যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয় যেমন তৈল, নেকড়া ইত্যাদি লইয়া লও। আর একটি পাতিল, কিছু ঘি এবং খাদ্য সামগ্রীও সঙ্গে করিয়া লও। তিনি এই সকল জিনিস লইয়া চলিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) স্বয়ং পিছনে পিছনে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) তাঁবুর ভিতরে চলিয়া গেলেন আর হযরত ওমর (রাযিঃ) আগুন জ্বালাইয়া পাতিলে খাদ্য ফুটাইলেন এবং ঘি ঢালিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গেল। হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) ভিতর হইতে আওয়াজ দিয়া বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার বন্ধুকে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিন। 'আমীরুল মুমিনীন' শব্দ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গেল। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। তিনি পাতিলটি তাঁবুর কাছে রাখিয়া বলিলেন, মহিলাকেও কিছু খাওয়াইয়া দাও। হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) মহিলাকে খাওয়াইলেন। অতঃপর পাতিলটি বাহিরে রাখিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বেদুঈনকে বলিলেন, তুমিও কিছু

খাইয়া লও, সারারাত্র তুমি জাগ্রত অবস্থায় কাটাইয়াছ। অতঃপর স্ত্রীকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন আর বেদুঈনকে এই কথা বলিয়া আসিলেন যে, আগামীকাল আসিও, তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে। (আশ্‌হার)

ফায়দা ঃ আমাদের এই যমানার কোন বাদশাহ বা নেতা নহে কোন সাধারণ পর্যায়ের ধনী ব্যক্তিও কি এমন আছে যে কোন গরীবের. প্রয়োজনে, মুসাফিরের সাহার্য্যার্থে এইভাবে স্ত্রীকে রাত্রে ময়দানে লইয়া যাইবে আর স্বয়ং নিজে চুলা ফুঁকিয়া খানা পাকাইবে।

ধনীদেরকে ছাড়ুন, কোন দ্বীনদার লোকও কি এইরূপ করে? চিন্তা করা উচিত হয় আমরা যাহাদের অনুসারী, প্রত্যেক কাজে তাহাদের মত বরকত পাওয়ার আশা রাখি, কোন একটি কাজও কি আমরা তাহাদের মত করি?

(৯) হযরত আবু তালহা (রাযিঃ)এর বাগান ওয়াকফ করা

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আবু তালহা আনসারী (রাযিঃ) মদীনা মুনাওয়ারাতে সবচাইতে বেশী এবং বড় বাগানের অধিকারী ছিলেন। তাহার বইরাহা নামে একটি বাগান ছিল। বাগানটি তাহার কাছে অত্যধিক প্রিয় ছিল। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এই বাগানটিতে প্রচুর পরিমাণে সুমিষ্ট পানি ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রায় এই বাগানে যাইতেন এবং উহার পানি পান করিতেন। যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইল— لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ, তোমরা (পূর্ণমাত্রায়) নেকী অর্জন করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এমন বস্তু হইতে খরচ না করিবে যাহা তোমাদের নিকট পছন্দনীয়।

তখন হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, বাইরাহা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাগান। আর আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। তাই উহা আল্লাহর রাস্তায় দান করিতেছি। আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন উহাকে খরচ করিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, খুবই উত্তম মাল। আমি ইহাই ভাল মনে করিতেছি যে, তুমি ইহা নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। আবু তালহা (রাযিঃ) উহা নিজ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

(দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ আমরাও কি নিজেদের কোন প্রিয় সম্পদ একটু ওয়াজ-নসীহত শুনিয়া অথবা কুরআন শরীফের দুই একটি আয়াত পাঠ

করিয়া কিংবা শ্রবণ করিয়া নির্দ্বিধায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেই? ওয়াকফ করিবার চিন্তা-ভাবনা করিলেও তাহা জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলে অথবা ওয়ারিসদের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া গেলে তাহাদেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে হয়। তদুপরি বছরের পর বছর এই চিন্তা করিতে থাকি যে, এমন কোন পথ বাহির হয় কিনা যাহা দ্বারা জীবদ্দশায় উহা আমার উপকারে আসে পরে যাহা হইবার হউক। হাঁ, সুনাম অর্জনের কোন বিষয় হইলে কিংবা বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠান হইলে তখন সুদী ঋণ গ্রহণ করিতেও কোন দ্বিধা থাকে না।

(১০) হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর নিজ খাদেমকে সতর্ক করা

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ১নং অধ্যায়ে ৫নং ঘটনায় আলোচিত হইয়াছে। তিনি বড় ধরনের যাহেদ (অর্থাৎ দুনিয়া বিরাগী) ছিলেন। ধন-সম্পদ নিজে জমা করিতেন না, অন্য কেহ জমা করুক ইহাও চাহিতেন না। মালদারদের সাথে সর্বদা তাঁহার ঝগড়া হইত। তাই হযরত উছমান (রাযিঃ)এর নির্দেশে তিনি মরুভূমির 'রাবাযাহ্' নামক স্থানে একটি সাধারণ আবাদিতে বসবাস করিতেছিলেন। হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর নিকট কয়েকটি উট ছিল এবং একজন দুর্বল রাখাল ছিল। সে উহার দেখাশুনা করিত এবং উহার উপরই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বনু সুলাইম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার খেদমতে থাকিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিল এবং বলিল, আমি আপনার খেদমতে থাকিয়া আপনার ফয়েজ হইতে উপকৃত হইব এবং আপনার রাখালের সহযোগিতা করিব এবং আপনার নিকট হইতে বরকতও হাসিল করিব। হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার বন্ধু সেই ব্যক্তি যে আমাকে মানিয়া চলে। তুমি যদি আমাকে মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হও তবে আগ্রহের সহিত থাকিতে পার। আর যদি আমার কথা অনুসারে না চলিতে পার তবে তোমার প্রয়োজন নাই। সুলাইমী লোকটি বলিল, কোন্ বিষয়ে আপনার আনুগত্য করিব? হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি যখন কোন মাল খরচ করিবার আদেশ করিব তখন সর্বোত্তম মাল খরচ করিতে হইবে। লোকটি বলিল, ঠিক আছে আমি ইহা মানিয়া লইলাম। এই বলিয়া সে থাকিতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে একদিন কেহ তাঁহার নিকট আলোচনা করিল যে, অমুক জলাশয়ের নিকট কিছু লোক বাস করে। তাহারা অভাবগ্রস্ত। তিনি আমাকে বলিলেন, একটি উট লইয়া আস। আমি যাইয়া দেখিলাম, একটি

উট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান, কাজের উপযোগী ও সওয়ারী হিসাবেও অনুগত। আমি ওয়াদা অনুযায়ী উহাই আনিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু ভাবিলাম যে, ইহা তো গরীব মিসকীনদেরকেই খাওয়ানো হইবে। ইহা অত্যন্ত কাজের উপযোগী, হযরতের এবং তাঁহার সাথীদের প্রয়োজনে লাগিবে। কাজেই ঐ উটটি বাদ দিয়া আরেকটি উট লইয়া যাহা বাকীগুলির তুলনায় উত্তম ছিল তাঁহার কাছে হাজির হইলাম। তিনি দেখিয়াই বলিলেন, তুমি তো খেয়ানত করিয়াছ। আমি ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলিলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া ঐ উটটিই লইয়া আসিলাম। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এমন দুইজন লোক আছে কি, যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে একটি কাজ করিবে? এই কথা শুনিয়া দুইজন লোক দাঁড়াইল এবং নিজেদেরকে পেশ করিল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, এই উটটি জবাই কর। তারপর ইহার গোশত কাটিয়া ঐ জলাশয়ের নিকট যত ঘর আবাদ আছে হিসাব কর। আবু যরের ঘরও তন্মধ্যে একটি গণ্য করিয়া সবাইকে সমানভাবে বন্টন করিয়া দাও। আমার ঘরেও ঐ পরিমাণ দিবে যেই পরিমাণ তাহাদের প্রত্যেক ঘরে দিবে। তাহারা নির্দেশ অনুযায়ী বন্টন করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার যে উপদেশ ছিল উত্তম মাল খরচ করার উহা জানিয়া শুনিয়া লঙ্ঘন করিয়াছ, নাকি ভুলবশতঃ? যদি ভুলবশতঃ এইরূপ করিয়া থাক তবে তুমি নির্দোষ। আমি বলিলাম, আমি আপনার উপদেশ ভুলি নাই, আমি প্রথমে ঐ উটটিকেই লইয়াছিলাম কিন্তু ভাবিলাম যে, ইহা কাজের খুবই উপযোগী অধিকাংশ সময় আপনার প্রয়োজনে আসে। শুধু এই কারণে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, শুধু আমার প্রয়োজনে রাখিয়া আসিয়াছিলে? আমি বলিলাম, শুধু আপনার প্রয়োজনেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমার প্রয়োজনের দিন কোন্‌টি বলিব? আমার প্রয়োজনের দিন সেইদিন, যেইদিন আমি একাকী কবরের গর্তে নিক্ষিপ্ত হইব। ঐ দিনই আমার প্রয়োজন ও অভাবের দিন। মালের মধ্যে তিন জন অংশীদার রহিয়াছে। প্রথম হইতেছে তাকদীর। ইহা মাল লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে কাহারো অপেক্ষা করে না এবং ভালমন্দ সবধরনের মালই লইয়া যায়। দ্বিতীয় হইতেছে ওয়ারিস। সে তোমার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। তোমার মৃত্যু হইলেই সে উহা লইয়া যাইবে। তৃতীয় অংশীদার স্বয়ং তুমি। যদি সম্ভব হয় এবং তোমার ক্ষমতায় থাকে তবে তিন অংশীদারেরমধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক অক্ষম হইও না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ, তোমরা সর্বাধিক প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করা পর্যন্ত নেকী লাভ করিতে পারিবে না। তাই যেই মাল আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় উহাকে আমি আমার জন্য আগে পাঠাইয়া দিব যাহাতে ইহা আমার জন্য জমা থাকে।

(দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ তিন অংশীদারের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক বেশী অক্ষম হইও না—এই কথার অর্থ হইল, তুমি যতদূর সম্ভব নিজের জন্য পরকালের সম্বল জমা করিয়া লও। এমন যেন না হয় যে, তকদীরের ফয়সালা আসিয়া গেল আর তোমার মাল ধ্বংস হইয়া গেল অথবা তোমার মৃত্যু হইয়া গেল আর সমস্ত মাল অন্যদের হস্তগত হইয়া গেল। কারণ মৃত্যুর পর কেহ কাহারো খবর নিবে না। পরিবার পরিজন স্ত্রী–সন্তান অল্প কিছুদিন কান্নাকাটি করিয়া চুপ হইয়া যাইবে। এমন খুবই কম হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য সদকা–খয়রাত করিবে বা তাহাকে স্মরণ করিবে।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ বলে আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল হইল উহা যাহা সে খাইয়া ও শেষ করিয়া দিয়াছে অথবা পরিধান করিয়াছে ও পুরাতন করিয়া দিয়াছে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া নিজের জন্য খাজানায় জমা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে তাহা অপরের মাল ; অপরের জন্য জমা করিতেছে।

আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যাহার নিকট তাহার ওয়ারেছের মাল নিজের মাল অপেক্ষা ভাল লাগে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন লোক কে হইবে যাহার নিকট অন্যের মাল নিজের মাল হইতে বেশী প্রিয় হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিজের মাল উহাই যাহা সে আগে পাঠাইয়া দেয় আর যাহা রাখিয়া যায় তাহা ওয়ারেছদের মাল।

(১১) হযরত জাফর (রাযিঃ)এর ঘটনা

হযরত জাফর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং হযরত আলী (রাযিঃ)এর আপন সহোদর ভাই ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা সকলেই বংশগতভাবে বরং তাহাদের সন্তান–সন্ততিরাও দানশীলতা দয়া বীরত্ব ও বাহাদুরীতে অতুলনীয় ছিলেন। তবে হযরত জাফর (রাযিঃ) বিশেষভাবে গরীব মিসকীনদের সাথে সম্পর্ক রাখিতেন

এবং তাহাদের সহিত উঠাবসা করিতেন। কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া প্রথমে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানেও কাফেররা তাঁহার পিছু লইলে তাঁহাকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট নিজের সাফাই বর্ণনা করিতে হয়। যাহার বর্ণনা প্রথম অধ্যায়ের ১০নং ঘটনায় আলোচিত হইয়াছে। সেখান হইতে ফিরিবার পথে মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত করেন। অতঃপর মূতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন যাহার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ের শেষ দিকে আসিতেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া সমবেদনা জানাইবার জন্য তাঁহার ঘরে যান। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মদ সকলকে ডাকাইলেন। তাহারা সকলে অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাহাদের মাথায় হাত বুলাইলেন এবং তাহাদের জন্য বরকতের দোয়া করিলেন। সব ক'জন সন্তানই পিতার গুণে গুণান্বিত ছিল কিন্তু হযরত আবদুল্লাহর মধ্যে দানশীলতার গুণ অত্যন্ত বেশী ছিল। এইজন্যই তাঁহার উপাধি ছিল 'কুত্‌বুস সাখা' অর্থাৎ দানশীলতার কেন্দ্রবিন্দু।

সাত বৎসর বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত হন। এই আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের মাধ্যমে এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট সুপারিশ করাইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহাতে সে হযরত আবদুল্লাহর নিকট চল্লিশ হাজার দেরহাম হাদিয়া পাঠাইল। তিনি উহা ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা আমাদের নেকী বিক্রয় করি না। একবার তাঁহার নিকট কোথাও হইতে হাদিয়া স্বরূপ দুই হাজার দেরহাম আসিয়াছিল। তিনি উহা সেই মজলিসেই বন্টন করিয়া দিলেন। এক ব্যবসায়ী বহু পরিমাণ চিনি লইয়া বাজারে আসিল কিন্তু উহা বাজারে বিক্রয় হয় নাই বলিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইল। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর আপন কর্মচারীকে বলিলেন, এই ব্যক্তির সমস্ত চিনি খরিদ করিয়া লও এবং মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দাও। রাত্রে গোত্রের মধ্যে যত মেহমান আসিত তাঁহার ঘরেই খানাপিনা ও সবরকমের প্রয়োজন পুরা করিত। (ইসাবাহ)

হযরত যুবাইর (রাযিঃ) কোন এক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। একদিন নিজের ছেলে আবদুল্লাহকে অসিয়ত করিলেন যে, আমার ধারণা হয় আমি আজ শহীদ হইয়া যাইব। তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিও এবং অমুক অমুক কাজ করিও। এই অসিয়ত করিবার পর ঐদিনই তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। ছেলে ঋণের হিসাব করিয়া দেখিল যে, উহার পরিমাণ বাইশ লক্ষ দেরহাম। আর এই সমস্ত ঋণ এইভাবে হইয়াছে যে,

তিনি বড় প্রসিদ্ধ আমানতদার ছিলেন। লোকেরা তাঁহার নিকট খুব বেশী পরিমাণে নিজেদের আমানত রাখিত। তিনি বলিতেন, আমানত রাখিবার জায়গা আমার কাছে নাই। ইহা কর্জস্বরূপ আমার কাছে থাকিবে। যখন তোমাদের প্রয়োজন হইবে লইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি এই সমস্ত টাকা-পয়সা সদকা করিয়া দিতেন। আর তিনি এই অসিয়তও করিয়াছিলেন যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলে আমার মাওলার কাছে বলিবে। ছেলে আবদুল্লাহ বলেন, আমি মাওলার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার মাওলা কে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, যখনই কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতাম তখন বলিতাম, হে যুবাইরের মাওলা! অমুক কাজটি হইতেছে না। তৎক্ষণাৎ ঐ কাজ সমাধা হইয়া যাইত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে বলিলাম, আমার পিতার কর্জের তালিকায় দশ লক্ষ দেরহাম আপনার জিম্মায় লিখা আছে। তিনি বলিলেন, যখন ইচ্ছা নিও। পরে জানিতে পারিলাম, ইহা আমার ভুল হইয়া গিয়াছে। পুনরায় তাহার নিকট যাইয়া বলিলাম, উহা তো আপনিই তাহার নিকট পাওনা রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। আমি বলিলাম, আমি মাফ করাইতে চাই না। তিনি বলিলেন, যখন তোমার সুযোগ হয় পরিশোধ করিয়া দিও। আমি বলিলাম, ইহার পরিবর্তে জমিন গ্রহণ করুন। গনীমতের মাল হিসাবে অনেক জমিন লাভ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আচ্ছা দিতে পার। আমি তাহাকে সাধারণ এক খণ্ড জমি দিয়া দিলাম যাহাতে পানি ইত্যাদির ব্যবস্থাও ছিল না। তিনি সাথে সাথে গ্রহণ করিয়া নিলেন এবং গোলামকে বলিলেন, এই জমিনে জায়নামায বিছাইয়া দাও। সে জায়নামায বিছাইয়া দিল। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর উহাতে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সেজদায় পড়িয়া রহিলেন। নামায হইতে ফারেগ হইয়া গোলামকে বলিলেন, এই জায়গাটি খনন কর। সে খনন করিতে শুরু করিল। সাথে সাথে একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। (উসদুল গাবাহ্)

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরামের জন্য এই ঘটনা ও এই ধরনের অন্যান্য ঘটনা যাহা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তেমন বড় কিছু ছিল না ; বরং তাঁহাদের সাধারণ অভ্যাসই ছিল এইরকম।

সপ্তম অধ্যায়

বীরত্ব, সাহসিকতা ও মৃত্যুর আগ্রহ

যাহার অনিবার্য ফল হইল বীরত্ব কেননা মানুষ যখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া নেয় তখন সবকিছুই করিতে পারে। সবরকম কাপুরুষতা, চিন্তা-ভাবনা বাঁচিয়া থাকার জন্যই হইয়া থাকে। যখন মৃত্যুর শওক ও আগ্রহ পয়দা হইয়া যায় তখন না সম্পদের মহব্বত থাকে, না শত্রুর ভয় থাকে। হায়! এই সমস্ত সত্যবাদীদের অসীলায় যদি আমারও এই দৌলত নসীব হইত।

(১) ইবনে জাহ্‌শ ও ইবনে সা'দের দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ (রাযিঃ) উহুদের যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে বলিলেন, হে সাদ! চল আমরা একসঙ্গে মিলিয়া দোয়া করি। প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন অনুসারে দোয়া করিবে এবং অপরজন আমীন বলিবে। কেননা এইভাবে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। উভয়ই এক কোণে যাইয়া দোয়া করিলেন। প্রথমে হযরত হযরত সা'দ (রাযিঃ) দোয়া করিলেন, 'হে আল্লাহ! আগামীকাল যখন যুদ্ধ হইবে তখন আমার মোকাবেলায় একজন বড় বীরকে নির্ধারণ করিও যে আমার উপর কঠিন হামলা করিবে আর আমিও তাহার উপর জোরদার হামলা করিব। অতঃপর তুমি আমাকে তাহার উওর জয়ী করিও আর আমি তাহাকে তোমার রাস্তায় হত্যা করিব। এবং তাহার গনীমত লাভ করিব।' হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, আমীন।

ইহার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) দোয়া করিলেন, 'হে আল্লাহ! আগামীকাল যুদ্ধের ময়দানে আমাকে এক বাহাদুরের সহিত মোকাবেলা করাইও যে প্রচণ্ড হামলাকারী হইবে। আমি তাহার উপর প্রচণ্ড হামলা করিব আর সেও আমার উপর প্রচণ্ড হামলা করিবে অতঃপর সে আমাকে শহীদ করিয়া দিবে। তারপর সে আমার নাক কান কাটিয়া ফেলিবে। কেয়ামতের দিন যখন আমি তোমার দরবারে হাজির হইব তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ওহে আবদুল্লাহ! তোমার নাক কান কেন কাটা হইয়াছে? আমি বলিব, 'হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের রাস্তায় কাটা হইয়াছে। তুমি বলিবে, সত্যিই আমারই রাস্তায় কাটা হইয়াছে।' হযরত সাদ (রাযিঃ) বলিলেন, আমীন।

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ হইল। উভয়ের দোয়া ঠিক যেভাবে তাহারা করিয়াছিলেন সেইভাবেই কবুল হইল। (খামীস) সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের দোয়া আমার দোয়া হইতে উত্তম ছিল। আমি সন্ধ্যায় দেখিলাম তাহার নাক কান একটি সুতায় গাঁথা। উহুদের যুদ্ধে তাহার তরবারীও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে গাছের একটি ডাল দিলেন যাহা তাহার হাতে যাইয়া তরবারীতে পরিণত হইয়া গেল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত উহা তাহার কাছে ছিল। পরবর্তীতে ইহা দুইশত দীনারে বিক্রয় করা হইল। (ইসাবাহ)

ফায়দা ঃ উক্ত ঘটনায় যেমন একদিকে পূর্ণ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ সাহসী দুশমনের সহিত মোকাবিলা করার আকাঙ্খা করা হইতেছে। তেমনি অপরদিকে পূর্ণ ইশ্‌ক ও মহব্বত অর্থাৎ মাহবুবের রাস্তায় শরীর খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার আকাঙ্খা করা হইতেছে এবং শেষে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন এইসব কেন হইয়াছে? তখন বলিব তোমার জন্য কাটা হইয়াছে।

رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں
مرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں

"কেহ তো জুলুম-অত্যাচারের স্মৃতিতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, আমার মরদেহের টুকরাগুলি শত মাজারে দাফন করিও।"

(২) উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রাযিঃ)এর বীরত্ব

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা পরাজয় হইয়াছিল। যাহার প্রধান কারণ ছিল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নির্দেশের উপর আমল না করা। যাহার আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ঘটনায় করা হইয়াছে। ঐ সময় মুসলমানগণ চারিদিক হইতে কাফেরদের বেষ্টনীতে আসিয়া গেলে অনেকে শহীদও হইয়া যান আবার কিছুসংখ্যক পলায়নও করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাফেরদের একটি দলের বেষ্টনীতে পড়িয়া যান। কাফেররা ইহা রটাইয়া দিয়াছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পেরেশান হইয়া পড়েন। আর এই কারণে অনেকেই ময়দান ছাড়িয়া চলিয়াও যান এবং এদিক সেদিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, কাফেররা যখন মুসলমানদেরকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমার

দৃষ্টি হইতে আড়াল হইয়া গেলেন তখন আমি সর্বপ্রথম তাঁহাকে জীবিতদের মধ্যে তালাশ করিলাম। সেখানে পাইলাম না। অতঃপর শহীদগণের মধ্যে যাইয়া খুঁজিলাম। সেখানেও তাঁহাকে পাইলাম না, তখন আমি মনে মনে বলিলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবেন ইহা তো কখনও হইতে পারে না। সম্ভবতঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের আমলের কারণে আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপন পাক রসূলকে আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন। তাই এখন সর্বোত্তম কাজ ইহাই যে, আমিও একটি তরবারী লইয়া কাফেরদের দলের ভিতরে ঢুকিয়া যাইব এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করিব। আমি তরবারী লইয়া হামলা করিলাম। এমনকি কাফেররা মাঝখান হইতে সরিয়া যাইতে থাকিল। এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের উপর আমার নজর পড়িল। তখন আমার খুশীর সীমা রহিল না। আমি বুঝিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাহার প্রিয়নবীর হেফাজত করিয়াছেন। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কাফেরদের দলের পর দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হামলা করিতে আসিল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে আলী! ইহাদেরকে বাধা দাও। আমি একাই সেই দলের মোকাবেলা করিলাম এবং তাহাদেরকে ফিরাইয়া দিলাম এবং কয়েকজনকে হত্যা করিলাম। ইহার পর আরেকটি দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তিনি পুনরায় হযরত আলী (রাযিঃ)এর প্রতি ইশারা করিলেন। তিনি আবার একাকী ঐ দলের মোকাবিলা করিলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিয়া হযরত আলী (রাযিঃ)এর বীরত্ব ও সাহায্যের প্রশংসা করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন— إِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ অর্থাৎ, আলী আমার আর আমিও আলীর। অর্থাৎ পূর্ণ একাত্মতার দিকে ইশারা করিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন— وَأَنَا مِنْكُمَا অর্থাৎ আমিও আপনাদের দুইজনের মধ্যে রহিয়াছি। (কুররাতুল উয়ূন)

ফায়দা ঃ একা একজন মানুষের পক্ষে একটি দলের মোকাবেলা করা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাইয়া জান দেওয়ার জন্য কাফেরদের দলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়া একদিকে যেমন হুযূরের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা ও মহব্বতের পরিচয় দেয় তেমনি অপরদিকে পূর্ণ বাহাদরী ও বীরত্বেরও পরিচয় বহন করে।

⑶ হযরত হানযালা (রাযিঃ)এর শাহাদত

হযরত হানযালা (রাযিঃ) উহুদের যুদ্ধে প্রথম হইতে শরীক ছিলেন না। বলা হয় যে, তাহার নূতন বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীর সহিত মিলনের পর গোসলের প্রস্তুতি লইতেছিলেন। এমনকি গোসলের জন্য বসিয়া মাথা ধৌত করিতেছিলেন। এমন সময় মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ঐ অবস্থায়ই তরবারী হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিলেন এবং কাফেরদের উপর হামলা করিলেন। বরাবর সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ঐ অবস্থায় শহীদ হইয়া গেলেন।

যেহেতু শহীদগণকে যদি কোন কারণে গোসল ওয়াজিব হইয়া না থাকে তবে গোসল ছাড়াই দাফন করিতে হয়, এইজন্য তাঁহাকেও এইভাবেই করা হইল, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিলেন যে, ফেরেশতারা তাঁহাকে গোসল দিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট ফেরেশতাদের গোসল দেওয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। আবু সাঈদ সায়েদী (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা শুনিয়া হানযালাকে যাইয়া দেখিলাম তখন তাহার মাথা হইতে পানি ঝরিতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়া খোঁজ লইয়া তাহার গোসল না করিয়া যাওয়ার কথা জানিতে পারিলেন। (কুররাতুল উয়ূন)

ফায়দা ঃ ইহাও চরম পর্যায়ের বীরত্ব। বীরপুরুষের জন্য নিজের সিদ্ধান্তে দেরী করা কষ্টকর হয়। তাই এইটুকু অপেক্ষাও করিলেন না যে, গোসল করিয়া লইবেন।

⑷ আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ)এর শাহাদত বরণের আকাঙ্খা

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) খোড়া ছিলেন। তাঁহার চার পুত্র ছিল। যাহারা অধিকাংশ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতেও হাজির হইতেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিতেন। উহুদের যুদ্ধে আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ)এর আগ্রহ পয়দা হইল যে, আমিও যাইব। লোকেরা বলিল, তুমি তো মাজুর মানুষ খোঁড়া হওয়ার কারণে তোমার চলাফেরা করা কষ্টকর। তিনি বলিলেন, ইহা কত বড় খারাপ কথা যে, আমার ছেলেরা জান্নাতে যাইবে আর আমি থাকিয়া যাইব! তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে উত্তেজিত করার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আমি তো দেখিতেছি যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া

ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমর (রাযিঃ) ইহা শুনিয়া অস্ত্র লইলেন এবং কেবলার দিকে মুখ করিয়া এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ "হে আল্লাহ! আমাকে আর পরিবারবর্গের দিকে ফিরাইয়া আনিও না।"

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আপন কওমের লোকদের নিষেধ করা এবং নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করিলেন। আর বলিলেন যে, আমি আশা করি আমি আমার খোড়া পাই লইয়া জান্নাতে চলাফেরা করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে অক্ষম করিয়াছেন। কাজেই তুমি না গেলে কি অসুবিধা? তিনি পুনরায় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়া দিলেন। আবু তালহা (রাযিঃ) বলেন, আমি আমরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, তিনি বীরদর্পে যাইতেছিলেন আর বলিতেছিলেন খোদার কসম! আমি জান্নাতের আগ্রহী। তাঁহার এক পুত্রও তাঁহার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া যাইতেছিল। পিতাপুত্র উভয়ই যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদত বরণ করিলেন।

তাহার স্ত্রী স্বামী এবং ছেলের লাশ উটের পিঠে উঠাইয়া মদীনায় দাফন করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতে লাগলেন। কিন্তু উট বসিয়া পড়িল, অতি কষ্টে উটকে মারপিট করিয়া উঠাইলেন এবং মদীনায় আনার চেষ্টা করিলেন কিন্তু উট উহুদের দিকেই ফিরিয়া থাকিল, তাহার স্ত্রী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, উটের প্রতি এই নির্দেশই রহিয়াছে। আমর কি রওনা হওয়ার সময় কিছু বলিয়াছিল? স্ত্রী আরজ করিলেন যে, কেবলার দিকে মুখ করিয়া তিনি এই দোয়া করিয়াছিলেন—اَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ "হে আল্লাহ! আমাকে আমার পরিবার– পরিজনের নিকট আর ফিরাইয়া আনিও না।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইজন্যই উট ঐদিকে যাইতেছে না। (কুররাতুল উয়ূন)

ফায়দা ঃ ইহারই নাম জান্নাতের প্রতি আগ্রহ আর ইহাই হইল আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সেই প্রকৃত ভালবাসা যাহার ফলে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) কোথা হইতে কোথায় পৌছিয়া গিয়াছেন যে, মৃত্যুর পরও তাঁহাদের সেই প্রেরণা ঐরূপেই থাকিয়া যাইত। যতই চেষ্টা করিতেন যাহাতে উট চলে, কিন্তু উট বসিয়া পড়িত অথবা উহুদের দিকে চলিত।

⑤ হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ)এর শাহাদত

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অত্যন্ত আদর যত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং ধনী ছেলেদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাহার পিতা তাঁহাকে দুইশত দেরহামের কাপড় জোড়া খরিদ করিয়া পরাইতেন। যুবক বয়সের ছিলেন, অত্যন্ত আদর-যত্নে ও মাল-ঐশ্বর্যে লালিত হইতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই পরিবারের লোকজনকে না জানাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন এবং এইভাবেই রহিলেন। কেহ যাইয়া পরিবারের লোকদেরকে জানাইয়া দিলো। তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া কয়েদ করিয়া রাখিল। কিছুদিন এইভাবে কাটাইবার পর কোন এক সুযোগে গোপনে পালাইয়া গেলেন এবং হাবশার দিকে হিজরতকারীদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যময় জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। এতই অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন যে, একবার হযরত মুসআব (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তাঁহার পরনে কেবল একটি মাত্র চাদর ছিল তাহাও কয়েক জায়গায় ছিঁড়া। এক জায়গায় কাপড়ের পরিবর্তে চামড়ার তালি লাগানো ছিল, তাঁহার বর্তমান অবস্থা এবং পূর্বের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

উহুদের যুদ্ধে মুহাজিরদের ঝাণ্ডা তাহার হাতে ছিল। যখন মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি অবিচল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকেন। জনৈক কাফের নিকটে আসিয়া তরবারী দ্বারা তাহার একটি হাত কাটিয়া ফেলে যেন ঝাণ্ডা নিচে পড়িয়া যায় এবং মুসলমানদের প্রকাশ্য পরাজয় হইয়া যায়। তিনি সাথে সাথে অপর হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করিলেন। কাফের তাহার অপর হাতটিও কাটিয়া ফেলিল, তখন তিনি উভয় বাহুর সাহায্যে বুকের সহিত ঝাণ্ডা আঁকড়াইয়া ধরিলেন যাহাতে পড়িয়া না যায়। সে কাফের তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। কিন্তু জীবিত থাকা অবস্থায় ঝাণ্ডাটি মাটিতে পড়িতে দেন নাই। অতঃপর ঝাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন তাহা উঠাইয়া লইল।

দাফনের সময় তাহার নিকট একটি মাত্র চাদর ছিল। উহা দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা যাইতেছিল না। মাথা ঢাকিতে গেলে পা খুলিয়া যাইত আর পা ঢাকিতে গেলে মাথা খুলিয়া যাইত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাদর দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও আর পায়ের দিকে ইযখির পাতা দ্বারা ঢাকিয়া দাও। (কুররাতুল উয়ূন, ইসাবাহ্)

ফায়দা ঃ ইহা হইল ঐ ব্যক্তির জীবনের শেষ সময়। যিনি অত্যন্ত আদর-যত্নে ও আরাম-আয়েশে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। দুইশত দেরহাম মূল্যের কাপড় জোড়া পরিধান করিতেন আর আজ কাফনের জন্য একটি পূর্ণ চাদরও তাহার মিলিতেছে না। আর অপর দিকে হিম্মত ও সাহসের অবস্থা এই যে, জীবন থাকা অবস্থায় ঝাণ্ডা হাত হইতে পড়িতে দেন নাই। উভয় হাত কাটা যাওয়ার পরও ঝাণ্ডা ছাড়িলেন না। অত্যন্ত আদর-যত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন কিন্তু ঈমান তাহাদের মধ্যে এতই দৃঢ়ভাবে স্থান করিয়া লইত যে, এই ঈমান তাহাদিগকে টাকা পয়সা আরাম-আয়েশ হইতে সরাইয়া নিজের মধ্যে মগ্ন করিয়া নিত।

⑥ কাদেসিয়ার যুদ্ধে হযরত সা'দ (রাযিঃ)এর চিঠি

ইরাকের যুদ্ধের সময় হযরত ওমর (রাযিঃ)এর স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল। সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে কয়েক দিন পর্যন্ত এই পরামর্শ চলিতেছিল যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর স্বয়ং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সমীচীন হইবে, নাকি মদীনায় থাকিয়া সৈন্য পাঠাইবার কাজে মশগুল থাকা সমীচীন হইবে। সাধারণ লোকদের রায় ছিল তাঁহার স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। আর বিশিষ্ট লোকদের রায় ছিল মদীনায় থাকিয়া সৈন্য প্রেরণের কাজ আঞ্জাম দেওয়া। পরামর্শকালে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)-এর সম্পর্কেও আলোচনা হয়, তাহাকে সকলে পছন্দ করিলেন যে যদি তাহাকে পাঠানো হয় তবে খুবই ভালো হইবে এবং তখন আর হযরত ওমর (রাযিঃ)এর যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না। হযরত সা'দ (রাযিঃ) অত্যন্ত বীরপুরুষ ও আরবের সিংহ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ফলকথা সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত সা'দ (রাযিঃ)কে পাঠানো হইল। তিনি যখন কাদেসিয়া নামক স্থানে হামলা করার উদ্দেশ্যে পৌছেন তখন ইরানের সম্রাট বিখ্যাত পাহলোয়ান রোস্তমকে তাঁহার মোকাবেলায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রোস্তম আপ্রাণ চেষ্টা করিল যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য। সম্রাটের কাছে আবেদন করিল, আমি আপনার কাছে থাকিলেই ভাল হইবে। আসলে সে বড় ভীত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিতেছিল যে, এখান হইতে আমি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিব এবং প্রয়োজনীয় শলাপরামর্শে আপনাকে সহযোগিতা করিব। কিন্তু

সম্রাট ইয়ায্‌দাজার্‌দ তাহার আবেদন গ্রহন করিল না এবং বাধ্য হইয়া তাহাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে হইল। (আশহার)

হযরত সা'দ (রাযিঃ) যখন রওয়ানা হইতে লাগিলেন তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলেন যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

"সা'দ! এই ধারণা যেন তোমাকে ধোকায় ফেলিয়া না দেয় যে, তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। আল্লাহ তায়ালা মন্দকে মন্দ দ্বারা ধৌত করেন না বরং মন্দকে উত্তম দ্বারা ধৌত করেন। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। তাঁহার দরবারে কেবল বন্দেগীই গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছে উচ্চ বংশীয় নিচ বংশীয় সকলেই সমান। সকলেই তাঁহার বান্দা এবং তিনি সকলের পালনকর্তা। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হয় বন্দেগীর মাধ্যমে। প্রত্যেক কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা কি ছিল তাহা লক্ষ্য রাখিবে। আর উহাই করণীয়। আমার এই উপদেশ স্মরণ রাখিবে। তোমাকে একটি মহান কাজের উদ্দেশ্যে পাঠানো হইতেছে। একমাত্র হকের অনুসরণের মাধ্যমেই এই দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ হইতে পারে। নিজেকে এবং নিজের সাথীদেরকে উত্তম কাজের অভ্যস্ত বানাইবে, আল্লাহর ভয় এখতিয়ার করিবে। আল্লাহর ভয় দুই জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়—তাঁহার আনুগত্য ও গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার মধ্যে। আল্লাহর আনুগত্য যাহার ভাগ্যেই নসীব হইয়াছে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের প্রতি ভালবাসার কারণেই নসীব হইয়াছে। (আশহার)

ইহার পর হযরত সা'দ (রাযিঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বাহিনী লইয়া রওয়ানা হইলেন যাহা রোস্তমের প্রতি তাঁহার প্রেরিত চিঠি দ্বারা অনুমান করা যায়। তিনি লিখেন—

فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّوْنَ الْاَعَاجِمُ الْخَمْرَ

"নিশ্চয়ই আমার সহিত এমন এক বাহিনী রহিয়াছে যাহারা মৃত্যুকে এইরূপ ভালবাসে যেমন তোমরা শরাব পান করাকে ভালবাস।"

(তাফসীরে আযীযী ঃ ১ম খণ্ড)

ফায়দা ঃ শরাবের আসক্ত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, শরাবে কি স্বাদ রহিয়াছে? আর যাহারা মৃত্যুকে ঐরূপ ভালবাসে, কামিয়াবী তাহাদের পদ চুম্বন করিবে না কেন?

(৭) উহুদের যুদ্ধে হযরত ওহ্‌ব ইবনে কাবুসের শাহাদতবরণ

হযরত ওহ্‌ব ইবনে কাবুস (রাযিঃ) একজন সাহাবী। যিনি কোন একসময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন এক গ্রামে নিজ বাড়ীতে বসবাস করিতেন। গ্রামে বকরী চরাইতেন। আপন ভাতিজাসহ বকরীগুলি এক রশিতে বাঁধিয়া মদীনায় পৌঁছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে গিয়াছেন। বকরীর পাল সেখানে রাখিয়াই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। এমন সময় কাফেরদের একটি দল আক্রমনরত অবস্থায় আগাইয়া আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হইবে। হযরত ওহ্‌ব (রাযিঃ) বীরবিক্রমে তরবারী চালাইতে শুরু করিলেন এবং সকলকে হটাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় বার আবার ঐরূপ হইল। তৃতীয়বারও ঐরূপ হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করিলেন। ইহা শুনিয়াই তিনি তরবারী হাতে লইয়া কাফেরদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, আমি লড়াইয়ের ময়দানে ওহ্‌ব (রাযিঃ)এর মত বীরত্ব ও সাহসিকতা আর কাহারো দেখি নাই। তাঁহার শাহাদতের পর আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, ওহ্‌বের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি।

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মোবারক হাতে তাঁহাকে দাফন করিলেন। যদিও এই যুদ্ধে স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আহত হইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিতেন, ওহ্‌বের আমলের উপর আমার যত ঈর্ষা হইয়াছে আর কাহারও আমলের উপর এইরূপ ঈর্ষা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হয় তাহার মত আমলনামা লইয়া আল্লাহর দরবারে হাজির হই। (ইসাবাহ, কুররাতুল উয়ূন)

ফায়দা ঃ তাঁহার উপর ঈর্ষা হওয়ার কারণ হইল, তিনি জীবনকে তুচ্ছ মনে করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। নচেৎ স্বয়ং হযরত ওমর (রাযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবীদের ইহার চাইতেও অনেক বড় কীর্তি রহিয়াছে।

(৮) বীরে মাঊনার যুদ্ধ

বীরে মাঊনার একটি বিখ্যাত যুদ্ধ। যাহাতে সত্তর জন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর একটি বিরাট জামাত সম্পূর্ণরূপে শহীদ হইয়াছেন। তাঁহারা 'কুররা' নামে পরিচিত ছিলেন। কারণ তাঁহারা সকলেই কুরআনের হাফেজ ছিলেন। কয়েকজন মুহাজির ব্যতীত অধিকাংশ আনসারী সাহাবী ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কেননা, তাঁহারা রাত্রের অধিকাংশ সময় জিকির ও তেলাওয়াতে কাটাইতেন এবং দিনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের ঘরের প্রয়োজনসমূহ যেমন লাকড়ী পানি ইত্যাদি পৌঁছাইয়া দিতেন। সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের এই জামাতকে নজদের অধিবাসী বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি যাহার নাম আমের ইবনে মালেক এবং উপনাম ছিল আবু বারা, সে তাঁহাদেরকে নিজের আশ্রয়ে তাবলীগ ও ওয়াজ–নসীহতের নামে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াও ছিলেন যে, আমি আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা করিতেছি। কিন্তু সে ব্যক্তি জোরদারভাবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সত্তরজন সাহাবীকে তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং বনি আমেরের সর্দার আমের ইবনে তুফাইলের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি চিঠিও দিয়া দিলেন। তাঁহারা মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া বীরে মাঊনায় পৌঁছিয়া থামিলেন। অতঃপর হযরত ওমর ইবনে উমাইয়া ও মুনযির ইবনে ওমর এই দুইজন সকলের উটগুলিকে লইয়া চরাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। এবং হযরত হারাম (রাযিঃ) দুইজন সঙ্গীসহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া চিঠি লইয়া আমের ইবনে তুফাইলের নিকট গেলেন। কাছাকাছি পৌঁছিয়া হযরত হারাম (রাযিঃ) দুই সাথীকে বলিলেন, তোমরা এইখানে অবস্থান কর, আমি আগে যাইতেছি। যদি আমার সাথে কোন প্রতারণা বা গাদ্দারী না করা হয়, তবে তোমরাও চলিয়া আসিও নতুবা তোমরা এখান হইতে ফেরত চলিয়া যাইও। কেননা তিনজন মারা যাওয়ার চাইতে একজন মারা যাওয়া ভাল।

আমের ইবনে তুফাইল উক্ত আমের ইবনে মালেকের ভাতিজা ছিল, যিনি এই সকল সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে এই আমের ইবনে তুফাইলের চরম দুশমনী ছিল। হযরত হারাম (রাযিঃ) আমের ইবনে তুফাইলের কাছে চিঠি

হস্তান্তর করিলে সে ক্রোধে চিঠি না পড়িয়াই একটি বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া হযরত হারাম (রাযিঃ)–এর দেহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। হযরত হারাম (রাযিঃ)—فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ "কা'বার রবের কসম! আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।" এই বলিয়া শহীদ হইয়া গেলেন। সে ইহারও কোন পরওয়া করিল না যে, কোন দূতকে হত্যা করা কোন জাতির কাছেই বৈধ নয়। এমনিভাবে সে ইহারও পরওয়া করিল না যে, আমার চাচা তাঁহাদেরকে নিরাপত্তা দিয়াছে। হযরত হারামকে শহীদ করিবার পর সে গোত্রের লোকদেরকে সমবেত করিয়া তাহাদেরকেও উত্তেজিত করিল যে, একজন মুসলমানকেও তোমরা জীবিত রাখিও না। কিন্তু তাহারা আবুল বারা অর্থাৎ আমের ইবনে মালেকের নিরাপত্তা দানের বিষয়টি লইয়া একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাই সে আশেপাশের অন্যান্য লোকদেরকে সমবেত করিয়া বিরাট একটি দল লইয়া ঐ সত্তরজন সাহাবীর মোকাবিলা করিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবী বিরাট কাফেরদলের সাথে কতক্ষণ আর মোকাবিলা করিতে পারেন। উপরন্তু তাহারা চারদিক হইতে কাফেরদের বেষ্টনীর মধ্যে ছিলেন।

অবশেষে কেবল একজন সাহাবী কা'ব ইবনে যায়েদ ব্যতীত সকলেই শহীদ হইয়া যান। কা'ব ইবনে যায়েদের সামান্য নিঃশ্বাস বাকী ছিল। কাফেররা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। হযরত মুনযির ও হযরত ওমর (রাযিঃ) এই দুইজন উট চরাইতে গিয়াছিলেন। তাহারা আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন মৃতখাদক পাখী উড়িতেছে। তাঁহারা উভয়েই এই বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন যে, অবশ্যই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ঘটনাস্থলে আসিয়া সকল সাথীদেরকে শহীদ অবস্থায় পাইলেন। আর কাফেরদের ঘোড়সওয়ারদেরকে রক্তে রঞ্জিত তরবারী লইয়া তাহাদের চারিদিকে চক্কর লাগাইতে দেখিলেন। এই পরিস্থিতি দেখিয়া তাঁহারা থমকিয়া গেলেন এবং পরস্পর পরামর্শ করিলেন কি করা উচিত। ওমর ইবনে উমাইয়া বলিলেন, চল ফিরিয়া যাইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর জানাই। কিন্তু হযরত মুনযির বলিলেন, খবর তো হইয়াই যাইবে। আমার মন চাহিতেছে না যে, শাহাদাতকে বর্জন করি এবং এই স্থান হইতে চলিয়া যাই। যেখানে আমাদের বন্ধুরা পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সামনের দিকে অগ্রসর হও এবং সাথীদের সাথে যাইয়া মিলিত হও। অতএব উভয়েই সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। হযরত মুনযির শহীদ হইয়া গেলেন আর হযরত ওমর ইবনে উমাইয়্যা গ্রেফতার

হইলেন। যেহেতু আমেরের মা কোন এক কারণে গোলাম আযাদ করার মান্নত করিয়াছিল, সেই মান্নত আদায়ের উদ্দেশ্যে আমের তাহাকে আযাদ করিয়া দিল। (ইসলাম)

ঐ সকল শহীদানদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাও ছিলেন। তাঁহার ঘাতক জাব্বার ইবনে সালমা বলেন যে, আমি যখন তাহাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করি এবং তিনি শহীদ হইয়া যান তখন বলিলেন— فُزْتُ وَاللّٰهِ খোদার কসম! আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।

অতঃপর আমি দেখিলাম তাহার লাশ আকাশের দিকে উড়িয়া চলিয়া গেল। আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আমি পরে মানুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি নিজে তাহাকে বর্শা মারিয়াছি আর তিনি মারা গেলেন, কিন্তু তারপরও তিনি বলিলেন, 'আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি।' এই কামিয়াবী কি ছিল? লোকেরা বলিল যে, ঐ কামিয়াবী ছিল জান্নাতের। ইহাতে আমি মুসলমান হইয়া গেলাম। (খামীস)

ফায়দা ঃ ইহারাই হইলেন ঐসব লোক যাহারা যথার্থ অর্থেই ইসলামের জন্য গৌরব ছিলেন। নিঃসন্দেহে মৃত্যু তাঁহাদের কাছে শরাবের চাইতে অধিক প্রিয় ছিল। আর এইরূপ হইবেই না কেন? তাঁহারা তো দুনিয়াতে এমন কাজ করিয়াছেন যাহা দ্বারা আল্লাহর কাছে তাহাদের কামিয়াবী ও সফলতা নিশ্চিত ছিল। এইজন্য যিনি মৃত্যুবরণ করিতেন তিনি সফল হইতেন।

(৯) হযরত উমাইর (রাযিঃ)-এর উক্তি 'খেজুর খাওয়া দীর্ঘ জীবন'

বদরের যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা উঠ এবং অগ্রসর হও এমন জান্নাতের দিকে যাহার প্রস্থ আসমান-যমীনের চাইতেও বহু গুণ বেশী, যাহা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হইয়াছে। হযরত উমাইর ইবনে হামাম এক সাহাবী এইকথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, বাহ্! বাহ্! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কেন বাহ! বাহ! বলিলে? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আকাঙ্খা হয় আমিও তাহাদের মধ্য হইতে হইতাম! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও তাহাদের মধ্য হইতে। অতঃপর তিনি থলি হইতে কিছু খেজুর বাহির করিয়া খাইতে শুরু

করিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, হাতের খেজুরগুলি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা অনেক দীর্ঘ জীবন। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিব। এই বলিয়া খেজুর ফেলিয়া দিলেন এবং তলোয়ার হাতে লইয়া ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ)

ফায়দা ঃ প্রকৃতপক্ষে ইহারাই জান্নাতের কদর করিয়াছেন এবং উহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। আমাদেরও যদি অনুরূপ একীন নসীব হইয়া যায় তবে সবকিছু সহজ হইয়া যাইবে।

(১০) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর হিজরত

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত তাঁহার বাহাদুরী সম্পর্কে জানে এবং তাহার সাহসীকতাকে স্বীকার করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সকল মুসলমানরা দুর্বল ছিল তখন স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির জন্য হযরত ওমর (রাযিঃ)এর মুসলমান হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছেন। আর সেই দোয়া কবুলও হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা কা'বাঘরের নিকট নামায পড়িতে পারিতাম না। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি লুকাইয়া হিজরত করিয়াছে। যখন হযরত ওমর (রাযিঃ) হিজরতের ইচ্ছা করিলেন তখন গলায় তরবারী ঝুলাইয়া এবং হাতে বহু তীর ও ধনুক লইয়া সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করিলেন। ধীরস্থিরভাবে তাওয়াফ করিলেন এবং অত্যন্ত শান্তভাবে নামায আদায় করিলেন। অতঃপর কাফেরদের সমাবেশে যাইয়া বলিলেন যে, যাহার এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, তাহার মা ক্রন্দন করুক, তাহার স্ত্রী বিধবা হউক এবং তাহার সন্তানরা এতীম হউক, সে যেন মক্কার বাহিরে আসিয়া আমার সাথে মোকাবেলা করে। ভিন্ন ভিন্ন দলকে এই কথা শুনাইয়া চলিয়া গেলেন। কোন এক ব্যক্তিরও তাহাকে বাধা দেওয়ার হিম্মত হয় নাই। (উসদুল গাবাহ)

(১১) মুতা যুদ্ধের ঘটনা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বাদশাহদের নিকট তাবলীগী দাওয়াতনামা পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি পত্র হযরত হারেস ইবনে উমাইর অযদী (রাযিঃ)এর হাতে বুসরার বাদশার নিকটও

পাঠাইয়াছিলেন। যখন তিনি মূতা নামক স্থানে পৌছেন তখন শুরাহবীল গাস্সানী নামক কায়সারের জনৈক গভর্নর তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। দূতকে হত্যা করা কাহারও নিকটেই পছন্দনীয় নহে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং তিনি তিন হাজারের এক বাহিনী তৈয়ার করিয়া হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাযিঃ)কে তাহাদের উপর আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, যদি যায়েদ ইবনে হারেসা শহীদ হইয়া যায় তবে জাফর ইবনে আবি তালেব আমীর নিযুক্ত হইবে। আর সেও যদি শহীদ হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর নিযুক্ত হইবে। সেও যদি শহীদ হইয়া যায় তবে মুসলমানগণ যাহাকে পছন্দ করে আমীর বানাইয়া লইবে। এক ইহুদী এইসব কথাবার্তা শুনিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, এই তিনজন অবশ্যই শহীদ হইয়া যাইবেন। কেননা পূর্ববর্তী নবীগণের এই ধরনের কথার অর্থ ইহাই হইত।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা ঝাণ্ডা তৈরী করিয়া হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে দিলেন এবং নিজে এক জামাত সহকারে তাহাদেরকে বিদায় জানাইতে গেলেন। বিদায় দানকারীগণ যখন শহরের বাহিরে গিয়া বিদায় জানাইয়া ফিরিবার সময় মুজাহিদদের জন্য দোয়া করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিরাপদে সফলতার সাথে ফিরাইয়া আনেন এবং সমস্ত বিপদ–আপদ হইতে হেফাজত করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) ইহার জবাবে তিনটি কবিতা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ এই—

"আমি তো আমার রবের নিকট গোনাহের মাগফেরাত চাহিতেছি আর এই কামনা করিতেছি যে, একটি তরবারী যেন এমন হয় যাহা দ্বারা আমার রক্তের ফুয়ারা বইতে থাকে অথবা এমন একটি বর্শা হয় যাহা দ্বারা আমার হৃৎপিণ্ড ও কলিজা চিরিয়া বাহির হইয়া আসে। আর যখন মানুষ আমার কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তখন যেন এইকথা বলে যে, হে গাজী! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সফলকাম করুন। আর বাস্তবিকই তুমি হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সফলকাম ছিলে।

অতঃপর তাহারা রওয়ানা হইয়া গেলেন। শুরাহবীল তাঁহাদের এই রওয়ানা হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া একলক্ষ সৈন্যের একটি দল লইয়া মোকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া জানিতে পারিলেন যে, রোম সম্রাট হিরাকলও এক লক্ষ সৈন্য লইয়া মোকাবিলা করিবার জন্য আসিতেছে। এই খবরে তাঁহারা একটু দ্বিধাগ্রস্ত

হইয়া পড়িলেন যে, এই বিরাট বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করা হইবে নাকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সম্পর্কে অবহিত করা হইবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা কিসের ভয় করিতেছ? তোমরা কী উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছ? তোমাদের উদ্দেশ্যই তো হইল শহীদ হইয়া যাওয়া। আমরা কখনও শক্তি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করি নাই। আমরা তো কেবল ঐ দ্বীনের কারণে যুদ্ধ করিয়াছি যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সম্মান দান করিয়াছেন। সম্মুখে অগ্রসর হও দুইটি সফলতার যে কোন একটি অবশ্যই লাভ করিবে। হয়ত শহীদ হইবে নতুবা বিজয়ী হইবে। এই কথা শুনিয়া মুসলমানগণ সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হইলেন এবং মূতা নামক স্থানে পৌছিয়া যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) পতাকা হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল। শুরাহবীলের ভাই নিহত হইল এবং অন্যান্য সাথী পালাইয়া গেল। শুরাহবীল নিজেও পালাইয়া এক দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং হিরাকলের কাছে সাহায্য চাহিয়া লোক পাঠাইল। হিরাকল প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য পাঠাইল। প্রচণ্ড লড়াই চলিতে থাকিল। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) শাহাদত বরণ করিলেন। অতঃপর হযরত জাফর (রাযিঃ) পতাকা ধারণ করিলেন এবং নিজেই আপন ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন যাহাতে ফিরিয়া যাওয়ার কল্পনাও মনে না আসে। অতঃপর কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ এই—

"হে লোকসকল! জান্নাত কতই না সুন্দর আর জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া কতই না উত্তম, কতই না উত্তম জিনিস আর কতই না সুশীতল উহার পানি। রোমকদের উপর শাস্তির সময় আসিয়া গিয়াছে। তাহাদেরকে কতল করা আমার জন্যও জরুরী হইয়া গিয়াছে।"

এইসব কবিতাসমূহ পাঠ করিলেন, আর নিজের ঘোড়ার পা তো নিজেই কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহাতে ফিরিয়া যাওয়ার খেয়ালও অন্তরে না আসিতে পারে, তারপর তরবারী লইয়া কাফেরদের দলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমীর হওয়ার কারণে ঝাণ্ডা তাহার হাতে ছিল। প্রথমে ঝাণ্ডা ডান হাতে ধারণ করিয়াছিলেন। কাফেররা তাঁহার হাতটি কাটিয়া ফেলিল যাহাতে ঝাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ বাম হাতে নিলেন। যখন বাম হাতও কাটিয়া ফেলিল তখন উভয় বাহুর সাহায্যে পতাকা আটকাইয়া রাখিলেন এবং দাঁতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে উহা ধরিয়া রাখিলেন। এক ব্যক্তি পিছন হইতে হামলা করিয়া তাঁহাকে দুই টুকরা

করিয়া দিল ফলে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। ঐ সময় তাঁহার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, পরে যখন আমরা অন্যান্য লাশ হইতে হযরত জাফরের লাশ বাহির করিলাম তখন তাহার শরীরের সম্মুখভাগে নব্বইটি জখম দেখিতে পাইলাম। তাহার শাহাদতের পর লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ডাক দিল। তিনি বাহিনীর এক কোণে গোশতের একটি টুকরা খাইতেছিলেন, কেননা তিন দিন যাবৎ কিছু মুখে দেওয়ার মত মিলে নাই। ডাক শুনামাত্রই তিনি গোশতের টুকরা ফেলিয়া দিয়া নিজেকে তিরস্কার করতঃ বলিলেন, জাফর তো শহীদ হইয়া গিয়াছে আর তুমি দুনিয়া লইয়া মশগুল আছ। এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ঝাণ্ডা লইয়া যুদ্ধ শুরু করিলেন। হাতের একটি আঙ্গুলে আঘাত লাগিয়া উহা ঝুলিতে লাগিল। তিনি আঙ্গুলটি পায়ের নীচে রাখিয়া সজোরে হাত টান দিলেন। উহা পৃথক হইয়া গেল। উহা ফেলিয়া দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ ও অস্থির অবস্থায় মনে কিছুটা সংশয় ও দ্বিধারও সঞ্চার হইল যে, না হিম্মত না মোকাবিলা করার শক্তি। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবস্থায় কিছুক্ষণ মাত্র অতিবাহিত হইয়াছিল অতঃপর নিজের মনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মন! তোর কোন্ জিনিসের সখ বাকী রহিয়াছে যাহার ফলে এই সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে? যদি স্ত্রীর সখ থাকিয়া থাকে তবে স্ত্রী তিন তালাক। আর যদি গোলাম বাঁদীর সখ থাকিয়া থাকে তবে তাহারা আযাদ। আর যদি বাগ-বাগিচার শখ থাকিয়া থাকে তবে তাহা সবই আল্লাহর রাস্তায় সদকা। অতঃপর তিনি কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ—

"আল্লাহর কসম হে মন! তোমাকে সন্তুষ্টচিত্তে হউক বা অসন্তুষ্ট চিত্তে হউক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেই হইবে। দীর্ঘ এক যুগ তুমি নিশ্চিন্তে জীবন কাটাইয়াছ। চিন্তা করিয়া দেখ, শেষ পর্যন্ত তুমি এক ফোটা বীর্যই তো। লক্ষ্য কর কাফেররা মুসলমানদের উপর চড়াও হইয়া আসিতেছে। তোমার কি হইয়াছে যে, তুমি জান্নাতকে পছন্দ করিতেছ না। তুমি যদি কতল না হও তবে এমনিতেও একদিন মরিবেই।"

এই বলিয়া ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার চাচাতো ভাই এক টুকরা গোশত আনিয়া বলিলেন, এইটুকু খাইয়া কোমর সোজা করিয়া লও। কেননা কয়েকদিন যাবৎ তুমি কিছু খাও নাই। তিনি গোশতের টুকরাটি হাতে নিলেন। এমন সময় একদিক হইতে হামলার আওয়াজ আসিল। গোশতের টুকরাটি ফেলিয়া দিলেন এবং তরবারী হাতে লইয়া

ভীড়ের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত তরবারী চালাইতে থাকিলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর পুরা জিন্দেগীর ইহাই নমুনা। তাহাদের প্রতিটি ঘটনাই এইরূপ যাহা দুনিয়ার স্থায়িত্ব ও হীনতা এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহের শিক্ষা দেয়। সাহাবায়ে কেরামের তো প্রশ্নই উঠে না, তাবেয়ীগণও এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

একটি ভিন্ন রকম ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিতেছি। এতক্ষণ শত্রুর মোকাবিলা করার নমুনা দেখিয়াছেন, এখন শাসকের সামনে হক কথা বলার একটি নমুনা দেখুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"সর্বোত্তম জেহাদ হইল জালেম বাদশাহর সামনে হক কথা বলা।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) ও হাজ্জাজের কথোপকথন ঃ

হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অবশ্য তখনকার বাদশাহরা জালেম হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজও করিত। তথাপি দ্বীনদার ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের তুলনায় তাহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হইত। তাই মানুষ তাহাদিগকে অপছন্দ করিত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ)ও ইবনুল আশআসের সহিত মিলিয়া হাজ্জাজের মোকাবিলা করিয়াছেন। হাজ্জাজ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের পক্ষ হইতে গভর্নর ছিল। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। হুকুমত এবং বিশেষ করিয়া হাজ্জাজের তাহার প্রতি হিংসা ও শত্রুতা ছিল। যেহেতু তিনি হাজ্জাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাই শত্রুতা থাকাই স্বাভাবিক। যুদ্ধে হাজ্জাজ তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারে নাই। তিনি পরাজিত হওয়ার পর আত্মগোপন করিয়া মক্কা মুকাররমায় চলিয়া যান। হুকুমত মক্কার আগের গভর্নরকে অপসারণ করিয়া নিজের লোককে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করিল। নবনিযুক্ত গভর্নর সেখানে খুতবা পাঠ করে। খুতবার শেষে বাদশাহ আবদুল মালিকের এই ঘোষণাও শুনাইয়া দিল যে, যে ব্যক্তি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে আশ্রয় দিবে তাহার মঙ্গল হইবে না। ইহার পর গভর্নর নিজের পক্ষ হইতেও কসম খাইয়া এই ঘোষণা দিল যে, যাহার ঘরে সাঈদ ইবনে জুবাইরকে পাওয়া যাইবে তাহাকে হত্যা করা হইবে এবং তাহার ঘর

প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ীসহ ধ্বংস করিয়া দিব। যাহা হউক গভর্নর বড় কষ্টে তাহাকে গ্রেফতার করিয়া হাজ্জাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। হাজ্জাজ নিজের আক্রোশ মিটাইবার ও তাঁহাকে হত্যা করার সুযোগ পাইয়া তাহাকে সামনে ডাকিল ও প্রশ্ন করিল যাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ—

হাজ্জাজ ঃ তোমার নাম কি?

সাঈদ ঃ আমার নাম সাঈদ।

হাজ্জাজ ঃ কাহার পুত্র?

সাঈদ ঃ জুবাইরের পুত্র। (সাঈদ অর্থ সৌভাগ্যবান আর জুবাইর অর্থ সংশোধিত। যদিও নামে সাধারণতঃ অর্থ লক্ষণীয় থাকে না তবু হাজ্জাজের কাছে তাঁহার ভাল অর্থযুক্ত নাম পছন্দনীয় হয় নাই। এইজন্য সে বলিল) তুমি হইতেছ শাকী বিন কাসীর। (শাকী অর্থ হতভাগা আর কাসীর অর্থ ভগ্নবস্তু।)

সাঈদ ঃ আমার মা আমার নাম তোমার চেয়ে ভাল জানিতেন।

হাজ্জাজ ঃ তুমিও হতভাগা, তোমার মাও হতভাগা।

সাঈদ ঃ গায়েবের খবর তুমি ব্যতীত অন্য কেহ জানেন অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা।

হাজ্জাজ ঃ দেখ, আমি এখন তোমাকে হত্যা করিব।

সাঈদ ঃ তাহা হইলে আমার মা আমার নাম ঠিক রাখিয়াছেন।

হাজ্জাজ ঃ এখন আমি তোমাকে জীবনের পরিবর্তে কেমন জাহান্নামে পাঠাইতেছি।

সাঈদ ঃ আমি যদি জানিতাম ইহা তোমার ইচ্ছাধীন তবে তোমাকে মাবুদ বানাইয়া লইতাম।

হাজ্জাজ ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে তোমার আকীদা কি?

সাঈদ ঃ তিনি রহমতের নবী ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল ছিলেন, যিনি সর্বোত্তম উপদেশ সহ বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন।

হাজ্জাজ ঃ খলীফাদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

সাঈদ ঃ আমি তাঁহাদের রক্ষক নহি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জিম্মাদার।

হাজ্জাজ ঃ আমি তাহাদিগকে ভাল বলি, না মন্দ বলি?

সাঈদ ঃ যে বিষয় সম্পর্কে আমার জানা নাই সে সম্পর্কে আমি কি বলিতে পারি? আমার শুধু নিজের অবস্থা সম্বন্ধেই জানা আছে।

হাজ্জাজ ঃ তাঁহাদের মধ্যে তোমার মতে সর্বোত্তম কে?

সাঈদ ঃ যিনি আমার মালিককে সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছেন। কোন কোন কিতাবে এইরূপ উত্তর উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাঁহাদের অবস্থা হিসাবে একজন অপরজনের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য।

হাজ্জাজ ঃ তাঁহাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছেন কে?

সাঈদ ঃ ইহা তিনিই জানেন যিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে খবর রাখেন।

হাজ্জাজ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) জান্নাতে আছেন, না জাহান্নামে?

সাঈদ ঃ আমি যদি জান্নাতে এবং জাহান্নামে যাই এবং সেখানকার লোকদিগকে প্রত্যক্ষ করি তবে ইহা বলিতে পারিব।

হাজ্জাজ ঃ আমি কেয়ামতের দিন কেমন ব্যক্তি হইব?

সাঈদ ঃ আমি গায়েবের বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ।

হাজ্জাজ ঃ তুমি আমার সাথে সত্য কথা বলিতে চাহিতেছ না।

সাঈদ ঃ আমি মিথ্যাও বলি নাই।

হাজ্জাজ ঃ তুমি কখনও হাস না কেন?

সাঈদ ঃ হাসির কোন বিষয় দেখিতেছি না। আর ঐ ব্যক্তি কি হাসিবে যে মাটি হইতে সৃষ্টি, যাহাকে কেয়ামতের দিন হাজির হইতে হইবে আর যে দুনিয়ার ফেতনায় সর্বদা আক্রান্ত?

হাজ্জাজ ঃ আমি তো হাসি।

সাঈদ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

হাজ্জাজ ঃ আমি তোমাকে হত্যা করিব।

সাঈদ ঃ আমার মৃত্যুর ওসীলা বানানেওয়ালা নিজের কাজ শেষ করিয়া রাখিয়াছেন।

হাজ্জাজ ঃ আমি আল্লাহর কাছে তোমার চাইতে বেশী প্রিয়।

সাঈদ ঃ আল্লাহর উপরে কেহই এ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে পারে না যতক্ষণ না সে আপন মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়। আর গায়েবের বিষয় একমাত্র আল্লাহই জানেন।

হাজ্জাজ ঃ আমি এই সাহসিকতা কেন প্রদর্শন করিতে পারিব না অথচ আমি জামাতের বাদশাহের সঙ্গে আছি আর তুমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে আছ।

সাঈদ ঃ আমি জামাত হইতে পৃথক নহি আর আমি নিজেই ফেতনা পছন্দ করি না। আর যাহা তকদীরে আছে তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারে না।

হাজ্জাজ ঃ আমরা যাহা কিছু আমীরুল মুমিনীনের জন্য জমা করি উহাকে তুমি কিরূপ মনে কর?

সাঈদ ঃ আমি জানিনা তোমরা কি সঞ্চয় করিয়াছ। (হাজ্জাজ সোনা রূপা কাপড় চোপড় ইত্যাদি তাঁহার সামনে উপস্থিত করিল)

সাঈদ ঃ এইসব জিনিস ভাল যদি শর্ত মাফিক হয়।

হাজ্জাজ ঃ শর্তটি কি?

সাঈদ ঃ শর্ত হইল, তুমি এইগুলি দ্বারা এমন জিনিস খরিদ করিবে যাহা বিভীষিকাময় দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন শান্তি এবং নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। নচেৎ প্রত্যেক দুগ্ধদানকারিণী দুগ্ধপায়ীকে ভুলিয়া যাইবে, গর্ভপাত ঘটিয়া যাইবে এবং কোন মানুষেরই নেক আমল ব্যতীত অন্য কিছু কোনপ্রকার উপকার সাধন করিতে পারিবে না।

হাজ্জাজ ঃ আমরা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি তাহা ভাল জিনিস নয় কি?

সাঈদ ঃ তুমি যাহা সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ভাল-মন্দ তুমিই বুঝিতে পার।

হাজ্জাজ ঃ তুমি কি এইসব বস্তুর কোনটি নিজের জন্য পছন্দ করো?

সাঈদ ঃ আমি কেবল ঐ বস্তুই পছন্দ করি যাহা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়।

হাজ্জাজ ঃ তুমি ধ্বংস হও।

সাঈদ ঃ ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যাহাকে জান্নাত হইতে সরাইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়।

হাজ্জাজ ঃ (বিরক্ত হইয়া বলিল) বল আমি তোমাকে কিভাবে হত্যা করিব?

সাঈদ ঃ যেভাবে নিজের ব্যাপারে কতল হওয়া পছন্দ করো।

হাজ্জাজ ঃ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব কি?

সাঈদ ঃ আল্লাহর ক্ষমা হইল প্রকৃত ক্ষমা। তোমার ক্ষমা কিছুই নহে।

হাজ্জাজ জল্লাদ প্রতি তাহাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। যখন তাঁহাকে বাহিরে আনা হয় তখন তিনি হাসিতেছিলেন। এই সংবাদ হাজ্জাজের নিকট পৌঁছিলে পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

হাজ্জাজ ঃ তুমি হাসিলে কেন?

সাঈদ ঃ আল্লাহর উপর তোমার দুঃসাহস এবং তোমার প্রতি আল্লাহর ধৈর্য দেখিয়া।

হাজ্জাজ ঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিতেছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। অতঃপর জল্লাদকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমার সামনে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও।

সাঈদ ঃ আমি দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া নিবো। দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া কেবলামুখী হইয়া বলিলেন—

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমি অন্যসব কিছু হইতে বিমুখ হইয়া স্বীয় মুখ আল্লাহর দিকে ফিরাইতেছি যিনি আসমান -যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন আর আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

হাজ্জাজ ঃ ইহার চেহারা কেবলার দিক হইতে সরাইয়া নাসারাদের কেবলার দিকে ফিরাইয়া দাও। কেননা তাহারাও নিজের দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

সাঈদ ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ الْكَافِي بِالسَّرَائِرِ

"তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ রহিয়াছেন। যিনি গোপন রহস্যসমূহ জানেন।"

হাজ্জাজ ঃ তাহাকে উপুড় করিয়া দাও। (অর্থাৎ জমিনের দিকে মুখ করিয়া দাও) কেননা আমরা তো জাহেরের উপর আমল করার জিম্মাদার।

সাঈদ ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

"আমি তোমাদিগকে মাটি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছি আর উহার মধ্যে তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনিব। অনন্তর মাটি হইতেই তোমাদিগকে পুনরায় উঠাইব।"

হাজ্জাজ ঃ একে হত্যা করিয়া ফেল।

সাঈদ ঃ আমি তোমাকে এই কথার সাক্ষী বানাইতেছি—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

তুমি এই বিষয়টি সংরক্ষণ করিও। যখন আমি কেয়ামতের দিন তোমার সহিত মিলিত হইব তখন লইয়া লইব।

অতঃপর তাঁহাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইল। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন। হত্যা করার পর তাঁহার দেহ হইতে এত বেশী রক্তক্ষরণ হইয়াছে যাহা দেখিয়া স্বয়ং হাজ্জাজও বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। সে নিজের চিকিৎসককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চিকিৎসক বলিল, হত্যার সময় তিনি অত্যন্ত শান্ত ছিলেন। মনে কোন প্রকার ভয় ছিল না। তাই রক্ত

আপন অবস্থায় ছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য মানুষের রক্ত ভয়ের কারণে আগেই শুকাইয়া যায়। (ওলামায়ে সলফ, কিতাবুল ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ)

ফায়দা ঃ বিভিন্ন কিতাবে প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে কিছু বেশকম রহিয়াছে। যেহেতু আমার উদ্দেশ্য কেবল নমুনা পেশ করা, তাই এতটুকুই বর্ণনা করিলাম। তাবেয়ীগণের এই ধরনের বহু ঘটনা রহিয়াছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ মনীষী হক কথা বলার দরুন সর্বদা কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তবু কখনও হক ত্যাগ করেন নাই।

অষ্টম অধ্যায়

এলেমের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও একাগ্রতা

যেহেতু দ্বীনের মূল বিষয় হইল কালিমায়ে তৌহীদ আর উহাই যাবতীয় গুণাবলীর বুনিয়াদ, যতক্ষণ উহা না হইবে কোন নেক আমল কবুল হইবে না। এই কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বিশেষ করিয়া ইসলামের প্রথম যুগে কালিমায়ে তৌহীদের প্রচারে ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। ঐসময় তাহারা একাগ্রতার সহিত এলেমের চর্চার জন্য পুরাপুরি অবসর ছিলেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই সকল ব্যস্ততার সহিত এলমের প্রতি তাহাদের মগ্নতা, শওক আগ্রহ এই পরিমাণ ছিল যে, উহার ফলস্বরূপ আজ চৌদ্দশত বৎসর পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের এলম অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রহিয়াছে। যাহা একটি প্রকাশ্য বিষয়। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার পর যখন তাঁহারা কিছুটা অবসর হইলেন এবং মুসলমানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল তখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়—

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْآ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

অর্থ ঃ মুসলমানদের জন্য ইহা সঙ্গত নহে যে, সবাই একসঙ্গে বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং এইরূপ কেন করা হয় না যে, তাহাদের প্রত্যেক বৃহৎ দল হইতে একটি ক্ষুদ্র দল বাহির হইবে যাহাতে অবশিষ্ট লোকরা দ্বীনের সমঝ-বুঝ হাসিল করিতে থাকে এবং যাহাতে তাহারা যখন প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিবে তখন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ভয় দেখাইবে যেন তাহারা সতর্ক হয়। (বয়ানুল কুরআন)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا "তোমরা বাহির হও সর্বাবস্থায়—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় অথবা নিরস্ত্র অবস্থায়।"

আর— اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا "যদি তোমরা বাহির না হও তবে তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।"

এইসব আয়াত দ্বারা যে ব্যাপক হুকুম বুঝা যাইতেছে তাহা مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً দ্বারা মনসুখ অর্থাৎ রহিত হইয়া গিয়াছে।

সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তায়ালা বহু গুণের সমষ্টি দান করিয়াছিলেন। আর তখনকার জন্য ইহার প্রয়োজনও ছিল। কেননা এই একটি ক্ষুদ্র দলই দ্বীনের সমস্ত কাজ সামলাইতেছিলেন। কিন্তু তাবেয়ীনের যুগে যখন ইসলাম বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বিরাট দল তৈরী হইয়া গেল আবার সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় বিভিন্নমুখী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও বাকী রহিল না, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিভাগের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক পয়দা করিলেন। মুহাদ্দিসীনগণের একটি স্বতন্ত্র জামাত সৃষ্টি হইতে লাগিল যাহাদের কাজ ছিল হাদীসের সংরক্ষণ ও প্রসার। ফুকাহায়ে কেরামের একটি স্বতন্ত্র জামাত সৃষ্টি হইল। (যাহাদের কাজ ছিল মাসআলা উদঘাটন করা।) এমনিভাবে সুফী, কারী, মুজাহিদ মোটকথা দ্বীনের প্রতিটি বিভাগকে স্বতন্ত্রভাবে সামলানেওয়ালা সৃষ্টি হইল। তখনকার জন্য ইহাই সমীচীন ও আবশ্যকীয় ছিল। নতুবা প্রত্যেক বিভাগের উন্নতি সাধন কঠিন হইয়া পড়িত। কেননা একই ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করা খুবই দুষ্কর। এই গুণ আল্লাহ তায়ালা কেবল নবীগণকে বিশেষ করিয়া নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর ঘটনাবলী ছাড়াও অন্যদের ঘটনাও বর্ণনা করা হইবে।

১ ফতোয়ার কাজ করনেওয়ালা জামাতের তালিকা

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জেহাদে এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার কাজে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও ইলমী কাজেও সর্বদা মগ্ন ছিলেন এবং তাহারা প্রত্যেকে যখন যাহা অর্জন করিতেন উহা প্রচার করা ও পৌছানই তাহাদের কাজ ছিল, তথাপি তাঁহাদের একটি জামাত ফতোয়ার কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহারা খোদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

যুগেও ফতোয়ার কাজ করিতেন। তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ), হযরত ওমর (রাযিঃ), হযরত ওসমান (রাযিঃ), হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাযিঃ), হযরত হুযাইফা (রাযিঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ), হযরত আবু মূসা (রাযিঃ), হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ)। (তাল্‌কীহ)

ফায়দা ঃ ইহা ঐ সকল বুযুর্গদের এলেমের পরিপূর্ণতার পরিচয়, যাহাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই আহলে ফতোয়া বা মুফতী হিসাবে গণ্য করা হইত।

২ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর সংরক্ষিত হাদীসসমূহ জ্বালাইয়া দেওয়া

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পাঁচশত হাদীসের একটি ভাণ্ডার জমা করিয়াছিলেন। একরাত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, তিনি অস্থিরতার সাথে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছেন। আমি এই অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন কষ্ট হইতেছে, না কোন দুঃসংবাদ শুনিয়াছেন কিনা? মোটকথা, সারারাত্র এইভাবে অস্থিরতার মধ্যে কাটাইলেন এবং ভোরে আমাকে বলিলেন, তোমার কাছে যেসব হাদীস রাখিয়াছিলাম সেইগুলি লইয়া আস। আমি সেইগুলি লইয়া আসিলাম। তিনি সেইগুলি পুড়াইয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন জ্বালাইয়া ফেলিলেন? তিনি বলিলেন, আমার আশংকা হইল যে, এমন না হইয়া যায় যে, আমি মরিয়া যাই আর এইগুলি আমার নিকট থাকিয়া যায়, কারণ এইগুলির মধ্যে অন্যেদের নিকট হইতে শোনা হাদীসও রহিয়াছে যাহা হয়ত আমি নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছি অথচ বাস্তবে উহা নির্ভরযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় বর্ণনার মধ্যে কোন ভুল–ভ্রান্তি থাকিলে উহার দায় আমাকে বহন করিতে হইবে। (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ)

ফায়দা ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর পাঁচশত হাদীসের একটি কিতাব সংকলন করা তাহার এলেমের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও সীমাহীন আগ্রহের আলামত। আর পরবর্তীতে উহা পুড়াইয়া ফেলা ছিল

তাহার চরম সতর্কতা। বিশিষ্ট সাহাবীগণের হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বনের এই অবস্থাই ছিল। এইজন্যই অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম হইতে হাদীস খুব কম বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা হইতে আমাদের ঐসব লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাহারা মিম্বরে বসিয়া বেধড়ক হাদীস বলিয়া দেন। অথচ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবসময়ের সাথী ছিলেন। বাড়ীতে সফরে এমনকি হিজরতেরও সঙ্গী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যখন বাইয়াত গ্রহণের প্রশ্ন আসিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ভাষণ দিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আনসারদের মর্যাদা ও ফযীলত সম্বলিত কোন আয়াত বা হাদীস তাহার সেই ভাষণে বলিতে বাদ রাখেন নাই। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহার কুরআন সম্পর্কে কেমন জ্ঞান ছিল এবং কি পরিমাণ হাদীস মুখস্থ ছিল! এতদসত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক হাদীসই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতেও কমসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

৩ হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ)এর তবলীগ

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) যাঁহার এক ঘটনা সপ্তম অধ্যায়ের পাঁচ নম্বরে বর্ণনা করা হইয়াছে—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে তালীম ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য মদীনা মুনাওয়ারার ঐ জামাতের সহিত পাঠাইয়াছিলেন যাহারা মিনার ঘাঁটিতে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মদীনায় সর্বদা তালীম ও তাবলীগের কাজে লিপ্ত থাকিতেন। লোকদের কুরআন পড়াইতেন ও দ্বীনের কথা শিখাইতেন। আসআদ ইবনে যুরারা (রাযিঃ)এর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন এবং মুকরী (শিক্ষক) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

হযরত সাদ ইবনে মুয়ায (রাযিঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইর (রাযিঃ) উভয়ই সর্দার ছিলেন। এই বিষয়টি তাহাদের নিকট অপ্রিয় লাগিল। সা'দ (রাযিঃ) উসাইদ (রাযিঃ)কে বলিলেন, তুমি আসআদের নিকট যাইয়া বল, আমরা শুনিয়াছি তুমি একজন বিদেশী লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, সে আমাদের দুর্বল লোকদিগকে নির্বোধ বানাইতেছে

এবং ধোকা দিতেছে। তিনি আসআদের নিকট গেলেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই কথা বলিলেন। আসআদ বলিলেন, তুমি আগে তাহার কথাবার্তা শুন। যদি তোমার কাছে পছন্দ হয় তবে কবুল করিও, আর যদি পছন্দ না হয় তবে তাহাকে বাধা দিতে কোন আপত্তি নাই। উসাইদ বলিলেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা। অতঃপর তিনি কথা শুনিতে লাগিলেন। হযরত মুসআব (রাযিঃ) ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করিলেন এবং কুরআনের আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত উসাইদ (রাযিঃ) বলিলেন, কতই না উত্তম কথা আর কতই না উত্তম কালাম। আচ্ছা, তোমরা যখন কাহাকেও তোমাদের দ্বীনে দাখিল কর তখন কিরূপে কর? উত্তরে বলা হইল, তুমি গোসল কর, পবিত্র কাপড় পরিধান কর এবং কালিমায়ে শাহাদত পড়। হযরত উসাইদ (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ এইসব কাজ করিয়া মুসলমান হইয়া গেলেন।

অতঃপর তিনি হযরত সাদ (রাযিঃ)এর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। হযরত সাদ (রাযিঃ)এর সাথেও অনুরূপ কথাবার্তা হইল। সাদ ইবনে মুয়ায (রাযিঃ)ও মুসলমান হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় গোত্র বনুল আশহালের নিকট গিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের দৃষ্টিতে কেমন ব্যক্তি? তাহারা বলিল, সর্বোত্তম ব্যক্তি। অতঃপর তিনি তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের নারী–পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান না হইবে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনিবে, আমার জন্য তোমাদের সহিত কথা বলা হারাম। এই কথা শুনিয়া উক্ত গোত্রের নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মুসলমান হইয়া গেল। হযরত মুসআব (রাযিঃ) তাহাদের দ্বীন শিক্ষা দানের কাজে লাগিয়া গেলেন। (তালকীহ্)

ফায়দা ঃ ইহা সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ রীতি ছিল যে, যে কেহ মুসলমান হইতেন তিনি একজন মুবাল্লিগ হইয়া যাইতেন, ইসলাম সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিতেন তাহা প্রচার করিতেন এবং অন্যের কাছে পৌছাইয়া দিতেন। ইহা তাঁহাদের জীবনের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল যাহার জন্য কোন ব্যবসা–বাণিজ্য ক্ষেত খামার চাকুরী বাধা সৃষ্টি করিতে পারিত না।

④ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)এর তালীম

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং প্রসিদ্ধ কারী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব হইতে তিনি লেখাপড়া জানিতেন। আরব

দেশে সাধারণভাবে লেখার প্রচলন ছিল না, ইসলামের পর ইহার প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু তিনি পূর্ব হইতে লেখা জানিতেন তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকিয়া ওহীও লিখিতেন। কুরআন সম্বন্ধে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি ঐ সকল লোকদের মধ্যে ছিলেন, যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় পূর্ণ কুরআন হিফজ করিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, উবাই ইবনে কা'ব আমার উম্মতের বড় কারী। তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে আট রাত্রিতে কুরআন শরীফ খতম করার এহতেমাম করিতেন।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যেন তোমাকে কুরআন শরীফ শুনাই। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কি আমার নাম লইয়া বলিয়াছেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, তোমার নাম লইয়া বলিয়াছেন। এইকথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিতে লাগিলেন—

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

"আমার আলোচনা আমার চাইতে উত্তম, যাহা ঐ মহফিলে হইতেছে।"

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি যখন এলেম হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা তাইয়্যেবায় উপস্থিত হইলাম তখন মসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষা দানকারী অনেকেই ছিলেন এবং প্রত্যেক উস্তাদের নিকটই শাগরেদদের পৃথক পৃথক মজলিস ছিল। আমি সেসব মজলিস অতিক্রম করিয়া একটি মজলিসে পৌছিলাম, সেখানে একজন লোক মুসাফির বেশে কেবল দুইটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় বসিয়া হাদীস পড়াইতেছিলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কোন বুযুর্গ? উত্তরে বলা হইল যে, মুসলমানদের সরদার উবাই ইবনে কা'ব। আমি তাঁহার মজলিসে বসিয়া গেলাম। যখন তিনি হাদীসের ছবক হইতে অবসর হইয়া ঘরে যাইতেছিলেন আমিও তাঁহার পিছনে চলিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম একটি পুরাতন ঘর জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা। অতি সাধারণ আসবাব–পত্র এবং অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন। (তাবাকাত)

হযরত উবাই (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার পরীক্ষা স্বরূপ) এরশাদ ফরমাইলেন যে, কুরআন শরীফে (বরকত ও ফযীলতের দিক হইতে) সবচেয়ে বড় আয়াত

কোন্‌টি? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিলেন। আদবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পুনরায় একই উত্তর দিলাম। তৃতীয় বার যখন প্রশ্ন করিলেন তখন বলিলাম, আয়াতুল কুরসী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহতায়ালা তোমার জন্য তোমার এলেমকে মোবারক করুন।

একবার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াইতেছিলেন। নামাযে একটি আয়াত ছুটিয়া গেল। হযরত উবাই (রাযিঃ) লুকমা দিলেন। নামায শেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বলিয়া দিয়াছে? হযরত উবাই (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি বলিয়া দিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমিও ধারণা করিয়াছিলাম তুমিই বলিয়া থাকিবে। (মুসনাদে আহমদ)

ফায়দা ঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) এলেমের এই মশগুলি ও কুরআনের বিশেষ খেদমতে থাকা সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রত্যেক জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। হুযূরের কোন জিহাদ এমন নাই যাহাতে তিনি শরীক হন নাই।

(৫) হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)এর গুরুত্ব সহকারে ফেতনার এলম অর্জন করা

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল সাহেবুস–সির বা গোপন রহস্যবিদ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে মুনাফেকদের এবং বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে জানাইয়া দিয়াছিলেন। বলা হয় যে, একবার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত যত ফেতনা আসিবে সব ধারাবাহিকভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। এমন কোন ফেতনা সম্পর্কে যাহাতে তিনশত লোক শরীক হইবে, বলিতে ছাড়েন নাই। বরং উক্ত ফেতনার অবস্থা ও উহার নেতৃত্ব দানকারীর নাম, তাহার পিতার নাম, গোত্রের নামসহ সবকিছু স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছিলেন। হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন, লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভাল ও কল্যাণের বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত আর আমি জিজ্ঞাসা করিতাম অকল্যাণ ও অশুভ বিষয় সম্পর্কে যাহাতে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।

একবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্তমানে আমরা

আপনার বরকতে যে কল্যাণ ও মঙ্গলের উপর রহিয়াছি, ইহার পরও কি কোন মন্দ অবস্থা আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, ইহার পর মন্দ অবস্থা আসিবে। আমি আরজ করিলাম, উক্ত মন্দের পর কি পুনরায় ভাল অবস্থা আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হুযাইফা! তুমি আল্লাহর কালাম পড়, উহার মর্ম ও অর্থের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা কর এবং উহার হুকুম–আহকাম মানিয়া চল। (আমার মাথায় যেহেতু ঐ চিন্তাই চাপিয়াছিল কাজেই) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উক্ত মন্দের পর কি ভাল অবস্থা আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, পুনরায় ভাল অবস্থা আসিবে। কিন্তু অন্তর ঐ রকম থাকিবে না যেমন পূর্বে ছিল। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ভাল অবস্থার পর আবারও কি মন্দ আসিবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, এমন লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিবে এবং জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই যুগে যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে আমি কি করিব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি মুসলমানদের কোন ঐক্যবদ্ধ জামাত থাকে এবং তাহাদের কোন বাদশাহ থাকে তবে তাহার সহিত শরীক হইয়া যাইও। নচেৎ সমস্ত দল বর্জন করিয়া একা এক কোণে বসিয়া যাইও অথবা কোন বৃক্ষের গোড়ায় বসিয়া যাইও এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই বসিয়া থাকিও।

যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মুনাফেকদের সম্বন্ধে সবকিছু বলিয়া দিয়াছিলেন, তাই হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, আমার গভর্নরদের মধ্যে কোন মুনাফেক নাই তো? একবার হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলিলেন, একজন মুনাফেক আছে তবে আমি তাহার নাম বলিব না। হযরত ওমর (রাযিঃ) ঐ মুনাফেককে বরখাস্ত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ হযরত ওমর (রাযিঃ) আপন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা চিনিয়া থাকিবেন। কাহারও মৃত্যু হইলে হযরত ওমর (রাযিঃ) খোঁজ লইতেন যে, হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) জানাযাতে শরীক আছেন কিনা। যদি শরীক হইতেন তবে হযরত ওমর (রাযিঃ)ও তাহার জানাযার নামায পড়িতেন নচেৎ তিনিও পড়িতেন না।

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) ইন্তেকালের সময় অত্যন্ত ভীত ও অস্থির হইয়া কাঁদিতেছিলেন। লোকেরা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমি দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতেছি এই জন্য কাঁদিতেছি না বরং মৃত্যু আমার

প্রিয় জিনিস। তবে আমি কাঁদিতেছি এইজন্য যে, জানি না আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাইয়া দুনিয়া হইতে যাইতেছি, নাকি তাঁহার সন্তুষ্টি লইয়া। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহা আমার দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্ত। হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতএব তোমার সহিত আমার সাক্ষাতের মধ্যে বরকত দান কর। (আবূ দাউদ, উসদুল গাবাহ)

(৬) হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর হাদীস মুখস্থ করা

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) একজন বিখ্যাত ও মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। তাহার নিকট হইতে এত বেশী হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্য কোন সাহাবী হইতে এত অধিক বর্ণিত হয় নাই। লোকেরা ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইতেন যে, তিনি সপ্তম হিজরীতে মুসলমান হইয়া আসেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করিয়াছেন একাদশ হিজরীতে। প্রায় চার বছরের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক হাদীস কিভাবে মুখস্থ হইয়াছে? ইহার কারণ স্বয়ং আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, লোকেরা বলিয়া থাকে আবু হুরাইরা অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করে। আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহাদের হাটে-বাজারে যাওয়া-আসা করিতে হইত। আর আমার আনসারী ভাইরা ক্ষেত-খামারে কাজ করিতেন। তাহারা উহা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। আর আবু হুরায়রা ছিল সুফ্‌ফাবাসী মিসকীনদের মধ্য হইতে একজন মিসকীন। যে সর্বদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাহা কিছু খাবার ভাগ্যে জুটিত উহার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া পড়িয়া থাকিত। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকিত যখন তাহারা উপস্থিত থাকিত না এবং এমন বিষয় মুখস্থ করিয়া লইত যাহা তাহারা করিতে পারিত না।

একবার আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে স্মরণশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাদর বিছাও। আমি চাদর বিছাইলাম। তিনি দুই হাতে উহার মধ্যে কি যেন ইশারা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, চাদরটি মিলাইয়া লও। আমি চাদরটি বুকের সহিত মিলাইয়া লইলাম। ইহার পর হইতে আমি আর কোন জিনিস ভুলি নাই। (বুখারী)

ফায়দা ঃ আসহাবে সুফফা ঐ সমস্ত লোককে বলা হয়, যাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানকার অধিবাসীদের মত ছিলেন। তাহাদের জীবিকার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। তাহারা যেন হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান ছিলেন। কোথাও হইতে কোন হাদিয়া বা সদকা আসিলে উহা দ্বারাই অধিকাংশ সময় তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)ও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কখনও কখনও কয়েক বেলা অনাহারেও কাটিয়া যাইত। কখনও ক্ষুধার কারণে পাগলের মত অবস্থা হইয়া যাইত। (যাহা ৩য় অধ্যায়ের ৩নং ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিক মাত্রায় হাদীস মুখস্থ করা তাঁহার কাজ ছিল। যাহার বদৌলতে আজ সর্বাধিক হাদীস তাঁহার নিকট হইতেই বর্ণিত বলিয়া বলা হয়। ইবনে জাওযী (রহঃ) তালকীহ নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ হাজার তিনশত চুহাত্তরটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

একবার হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) জানাযা সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়িয়া আসিয়া যায় তাহার এক কীরাত সাওয়াব লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি দাফন কার্যেও শরীক হয় তাহার দুই কীরাত সাওয়াব লাভ হয়। আর এক কীরাত উহুদ পাহাড় হইতেও বেশী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) এই হাদীস সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলেন, আবু হুরাইরা! আপনি একটু চিন্তা করিয়া বলুন। এইকথা শুনিয়া তিনি রাগান্বিত হইয়া গেলেন এবং সোজা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট যাইয়া আরজ করিলেন, আমি আপনাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই কীরাত সম্পর্কিত হাদীস কি আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, হাঁ, শুনিয়াছি। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলিতে লাগিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাকে না বাগানে কোন গাছ লাগাইতে হইত, না বাজারে মাল বিক্রয় করিতে হইত। আমি তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়িয়া থাকিতাম আর শুধু এই কাজ ছিল যে, কোন হাদীস মুখস্থ করার জন্য মিলিয়া যায় আর কোন কিছু খাওয়ার জন্য মিলিয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের তুলনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অধিক সময় উপস্থিত থাকিতেন আর আমাদের চাইতে অধিক হাদীস আপনার জানা আছে। (আহমদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) এই কথাও বলেন যে, 'আমি দৈনিক বার হাজার বার ইস্তেগফার করি।' তাঁহার কাছে একটি সূতা ছিল। উহাতে

এক হাজার গিঁট লাগানো ছিল। রাত্রে সুবহানাল্লাহর তাসবীহ দ্বারা এই সংখ্যা পূর্ণ করার পূর্ব পর্যন্ত ঘুমাইতেন না। (তাযকিরাহ্)

(৭) মুসাইলামা কায্যাবের হত্যা ও কুরআন সংকলন

মুসাইলামা কায্যাব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাহার প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যেহেতু ঐ সময় আরব দেশে মুরতাদ হওয়া অর্থাৎ দ্বীন ত্যাগ করা জোরে-শোরে শুরু হইয়া গিয়াছিল তাই এই ফেতনা আরও জোরদার হইয়া উঠিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তি দান করিলেন এবং মুসাইলামা কায্যাব নিহত হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে সাহাবাদেরও একটি বড় জামাত শহীদ হইয়া গেলেন। বিশেষ করিয়া কুরআনে পাকের হাফেজগণের এক বড় জামাতও শহীদ হইয়া যান। হযরত ওমর (রাযিঃ) আমীরুল মোমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর নিকট যাইয়া আরজ করিলেন, এই যুদ্ধে বহু কারী শহীদ হইয়া গিয়াছেন। যদি এইভাবে দুই একটি যুদ্ধে আরো শহীদ হইয়া যায় তবে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার ভয় রহিয়াছে। তাই উহা এক জায়গায় লিখিয়া সংরক্ষণ করা দরকার। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি এমন কাজের সাহস কিরূপে করিতেছ, যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই? হযরত ওমর (রাযিঃ) বার বার বলিতে থাকেন এবং প্রয়োজন তুলিয়া ধরিতে থাকেন। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)ও একমত হইয়া গেলেন। অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)কে ডাকাইলেন। যাহার ঘটনা একাদশ অধ্যায়ের আঠার নম্বর বর্ণনায় আসিতেছে। যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম, তখন সেখানে হযরত ওমর (রাযিঃ)ও ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) প্রথমে আমাকে তাঁহার এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)এর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছে উহা শুনাইলেন। তারপর বলিলেন, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। তোমার প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণাও নাই। ইহাছাড়াও তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়ও ওহী লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলে। তাই এই কাজ তুমি কর। লোকদের নিকট হইতে কুরআন সংগ্রহ করিয়া উহা এক জায়গায় একত্র করো।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমাকে এই হুকুম দিতেন যে, অমুক পাহাড়কে ভাঙ্গিয়া এই দিক হইতে ঐদিকে স্থানান্তরিত করিয়া দাও তবে এইরূপ হুকুমও আমার জন্য কুরআনে পাক জমা করা অপেক্ষা সহজ ছিল। আমি আরজ করিলাম, আপনারা এইরূপ কাজ কিভাবে করিতেছেন যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই? তাঁহারা আমাকে বুঝাইতে থাকিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে বলিলেন, যদি তুমি উমরের সহিত একমত হও তবে আমি তোমাকে এই কাজের আদেশ করিব নচেৎ আমিও এই কাজের ইচ্ছা করিব না। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) বলেন, দীর্ঘ আলোচনার পর আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরেও কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ঢালিয়া দিলেন। অতএব আমি আদেশ পালনার্থে লোকদের নিকট যে সমস্ত অংশ বিক্ষিপ্তভাবে লিখা ছিল এবং যেসব অংশ সাহাবা কেরামদের অন্তরে সংরক্ষিত ছিল অর্থাৎ মুখস্ত ছিল সবগুলি তালাশ করিয়া জমা করি।

(দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ উক্ত ঘটনায় প্রথমতঃ তাহাদের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব অনুমান করা যায় যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেন নাই এমন কাজ করা হইতে তাহাদের নিকট পাহাড় সরাইয়া ফেলা সহজ ছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা জানা যায় যে, পবিত্র কালাম সংকলন করা যাহা দ্বীনের মূল ভিত্তি আল্লাহ তায়ালা তাহাদের আমলনামায় রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় জিনিস এই যে, হযরত যায়েদ (রাযিঃ) এই ব্যাপারে এত অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, কোন অলিখিত আয়াত গ্রহণ করিতেন না বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেসব আয়াত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল শুধু সেগুলিই গ্রহণ করিতেন এবং হাফেজদের সীনায় মুখস্থ কুরআনের সহিত মিলাইয়া দেখিতেন। যেহেতু সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ বিভিন্ন জায়গায় লিপিবদ্ধ ছিল এই কারণে সংগ্রহ করিতে যদিও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ; তবুও সব অংশই পাওয়া গিয়াছে। উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) যাহাকে স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে পাকের সবচেয়ে বেশী পারদর্শী বলিয়া ছিলেন তিনি তাহার সহযোগিতা করিতেন। এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁহারা সর্বপ্রথম কুরআন পাক জমা করেন।

⑧ হাদীস বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর সতর্কতা অবলম্বন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বিখ্যাত সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং তিনি ফতোয়াদানকারী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতও করিয়াছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। খাছ খাদেম হওয়ার কারণে সাহেবুন্না'ল (জুতা বহনকারী) সাহেবুল-বিসাদা (বালিশ বহনকারী) সাহেবুল-মিতহারা (অযুর পানি বহনকারী) এই সকল উপাধিও তাহার ছিল। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইসব কাজগুলি অধিকাংশ সময় তাহারই উপর ন্যস্ত থাকিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আমি যদি পরামর্শ ব্যতীত কাহাকেও আমীর নিযুক্ত করি তবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে নিযুক্ত করিব। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তোমার জন্য সর্বদা আমার মজলিসে হাজির হওয়ার অনুমতি রহিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন, কেহ যদি কুরআনে পাক যেভাবে নাযিল হইয়াছে ঠিক সেইভাবে পড়িতে চায় তবে সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিয়ম অনুযায়ী পড়ে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, ইবনে মাসউদ যে হাদীস তোমাদের কাছে বর্ণনা করে উহা সত্য বলিয়া মনে করিবে।

আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন ইয়ামন হইতে আসিলাম তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের মধ্য হইতে মনে করিতে থাকি। কেননা তিনি এবং তাহার মাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে ঘরের লোকদের ন্যায় অধিক পরিমাণে যাওয়া আসা করিতেন। (বুখারী)

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আবু আমর শাইবানী (রহঃ) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর নিকট রহিয়াছি, কখনও তাঁহাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া কোন কথা বলিতে শুনি নাই। তবে কখনও যদি কোন কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিতেন তবে তাঁহার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হইয়া যাইত।

আমর ইবনে মাইমুন (রাযিঃ) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর নিকট আসিতে থাকি, কিন্তু

কখনও তাঁহাকে কোন কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া বলিতে শুনি নাই। একবার হাদীস বর্ণনা করিতে গিয়া এইরূপ বলিয়া ফেলিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা বলিয়াছেন, তখনই শরীর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল, কপাল ঘর্মাক্ত হইয়া গেল এবং রগ ফুলিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, ইনশাআল্লাহ এমনই বলিয়াছেন অথবা ইহার কাছাকাছি অথবা ইহার চাইতে কিছু বেশী বা কম বলিয়াছেন। (মুকাদ্দামা আওজায, আহমদ)

ফায়দা ঃ ইহাই ছিল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতা। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে করিয়া লয়। এই ভয়েই তাঁহারা যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও জীবনী হইতেই মাসআলা বলিতেন তবু ইহা বলিতেন না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ বলিয়াছেন। কারণ খোদা না করুন মিথ্যা না হইয়া যায়। অপরদিকে আমাদের অবস্থা হইল, কোন প্রকার যাচাই-বাছাই না করিয়া নির্দ্বিধায় হাদীস বলিয়া দেই একটুও ভয় করি না। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করিয়া কোন কথা বলা বড় কঠিন যিম্মাদারী। উল্লেখ্য যে, হানাফী ফিকার অধিকাংশ বিষয়ই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে গৃহীত।

⑨ হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট হাদীস সংগ্রহের জন্য গমন

কাছীর ইবনে কাইস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, আমি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে কেবল একটি হাদীসের জন্য আসিয়াছি। আমি শুনিয়াছি যে, উহা আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন। আবু দারদা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য কোন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ ছিল না তো? সে বলিল, না। আবু দারদা (রাযিঃ) আবারো জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না তো? সে বলিল, না, কেবল হাদীসটি জানার জন্যই আসিয়াছি। আবু দারদা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন পথ চলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করিয়া

দেন আর ফেরেশতারা তালেবে ইলমের সন্তুষ্টির জন্য আপন ডানা বিছাইয়া দেয়। তালেবে ইলমের জন্য আসমান এবং যমীনের অধিবাসীরা ইস্তেগফার করে। এমনকি পানির মাছও তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করে। আর আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন যেমন চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকার উপর। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস, নবীগণ দীনার–দেরহামের ওয়ারিস বানান না বরং তাহারা ইলমের ওয়ারেস বানান। যে ব্যক্তি এলেম হাসিল করে সে এক বিরাট সম্পদ হাসিল করে। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) ফকীহ সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন। তাহাকে হাকীমুল উম্মত বলা হয়। তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত কালে ব্যবসা করিতাম। মুসলমান হওয়ার পর এবাদত এবং ব্যবসা উভয়টি একসঙ্গে করিতে চাহিলাম। কিন্তু দুইটি সক সঙ্গে সম্ভবপর হইল না। কাজেই আমাকে ব্যবসা ত্যাগ করিতে হইল। এখন আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, একেবারেই মসজিদের দরজার সামনেই একটি দোকান হইবে যদ্দরুন এক ওয়াক্ত নামাযও ছুটিবে না আর প্রতিদিন চল্লিশ দীনার করিয়া লাভ হইবে এবং আমি উহা আল্লাহর পথে সদকা করিয়া দিব। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এমন ব্যবসার প্রতি কেন অসন্তুষ্ট হইলেন যাহাতে নামাযও ছুটিবে না তদুপরি এত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রতিদিন আল্লাহর পথে খরচ হইবে? তিনি বলিলেন, হিসাব তো দিতে হইবেই।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) আরো বলেন, আমি মৃত্যুকে ভালবাসি আপন মাওলার সহিত সাক্ষাতের আগ্রহে, দরিদ্রতাকে ভালোবাসি বিনয় ও নম্রতার উদ্দেশ্যে আর রোগকে ভালোবাসি গোনাহ ধৌত হওয়ার কারণে। (তাযকেরাহ্)

উপরোক্ত ঘটনায় একটি মাত্র হাদীসের খাতিরে কত দীর্ঘ সফর করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে হাদীস অর্জনের জন্য সফর করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ছিল না। একটি হাদীস শুনা ও জানার উদ্দেশ্যে দূর দূরান্তের সফর তাহাদের কাছে অতি সহজ ব্যাপার ছিল।

শা'বী (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও কুফার অধিবাসী ছিলেন। একবার নিজের কোন শাগরেদকে একটি হাদীস শুনাইলেন এবং বলিলেন নাও ঘরে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে মিলিয়া গেল। নতুবা ইহার চাইতে সামান্য বিষয়ের জন্যও মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত সফর করিতে হইত। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় মদীনা তাইয়্যেবাই ছিল হাদীসের ভাণ্ডার।

যাহারা এলেমের অনুরাগী ছিলেন তাহারা এলেম অর্জনের উদ্দেশ্যে বড় বড় সফর করিয়াছেন।

বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন, আমি একটি হাদীসের খাতিরে রাতের পর রাত দিনের পর দিন পায়দল সফর করিয়াছি।

ইমামকুল শিরমনি ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর ২০৫ হিজরীতে অর্থাৎ মাত্র ১১ বছর বয়সে হাদীস অধ্যয়ন করিতে শুরু করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ)এর সকল গ্রন্থ বাল্যকালেই মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। আপন শহরে যত হাদীস পাওয়া যাইতে পারে সেইগুলি সংগ্রহ করার পর ২১৬ হিজরীতে সফর শুরু করেন। পিতার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল তাই এতিম ছিলেন। সফরে মাতা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। উহার পর বলখ, বাগদাদ, মক্কা মোকাররমা, বসরা, কুফা, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামেশক প্রভৃতি শহর সফর করেন এবং সকল স্থানে হাদীসের যে পরিমাণ সম্ভার মিলিয়াছে উহা হাসিল করিলেন। এত অল্প বয়সে হাদীসের উস্তায হইয়া যান যে, তখনও তাঁহার মুখে একটি দাড়িও গজায় নাই। তিনি বলেন, আমার বয়স যখন আঠার বছর তখন সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের ফয়সালা নামক গ্রন্থ রচনা করি।

হাশেদ (রহঃ) এবং তাহার এক সঙ্গী বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) আমাদের সহিত উস্তাযের নিকট যাইতেন। আমরা লিখিতাম আর তিনি এমনি আসিয়া যাইতেন। কিছুদিন পর আমরা তাঁহাকে বলিলাম, আপনি অযথা সময়ের অপচয় করিতেছেন। তিনি চুপ রহিলেন। কয়েকবার বলার পর তিনি বলিলেন, আপনারা আমাকে বিরক্ত করিতেছেন। দেখি আপনারা কি লিখিয়াছেন। আমরা হাদীসের সমষ্টি বাহির করিয়া দেখাইলাম যাহার সংখ্যা পনের হাজারের চাইতেও অধিক ছিল। তিনি এইসব হাদীস মুখস্থ শুনাইয়া দিলেন। আমরা তখন বিস্মিত হইয়া গেলাম।

(১০) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর আনসারীর নিকট গমন করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আমি এক আনসারীকে বলিলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে

কিন্তু এখনও সাহাবীদের বড় জামাত বর্তমান রহিয়াছে। চলুন আমরা তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মাসআলাসমূহ মুখস্থ করিয়া লই। উক্ত আনসারী বলিলেন, সাহাবাদের জামাত বর্তমান থাকিতে লোকেরা কি তোমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে? যাহা হউক তিনি হিম্মত করিলেন না। আমি মাসআলা সংগ্রহের পিছনে লাগিয়া গেলাম। যাহার সম্বন্ধেই শুনিতে পাইতাম যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে অমুক হাদীস শুনিয়াছেন, তাহার নিকট যাইয়া উহা অনুসন্ধান করিতাম। এইভাবে মাসআলার বিরাট এক ভাণ্ডার আনসারীদের নিকট হইতে পাইলাম। কাহারও কাছে যাইয়া দেখিতাম তিনি ঘুমাইয়া আছেন। তখন চাদর বিছাইয়া তাহার দরজার সামনে বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতাম। বাতাসের কারণে মুখে শরীরে ধুলিবালি উড়িয়া আসিয়া পড়িত কিন্তু আমি সেখানে বসিয়া থাকিতাম। যখন তিনি জাগ্রত হইতেন তখন যাহা জিজ্ঞাসা করার তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। তাহারা বলিতেন, তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই হইয়া কেন এত কষ্ট করিলে? আমাকে ডাকিলেই পারিতে। কিন্তু আমি বলিতাম, আমি এলেম শিক্ষার্থী, অতএব উপস্থিত হওয়ার বেশী উপযুক্ত ছিলাম। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি কতক্ষণ যাবৎ বসিয়া আছ? আমি বলিতাম দীর্ঘক্ষণ যাবৎ। তিনি বলিতেন, ইহা ভাল কর নাই। আমাদেরকে জানাইলে না কেন? আমি বলিতাম, আমার কাছে ইহা ভাল মনে হয় নাই যে, আমার কারণে আপনি নিজ প্রয়োজন হইতে অবসর হওয়ার পূর্বেই আসিয়া যাইবেন। অবশেষে একদিন এমন এক সময় আসিল যে, লোকেরা আমার নিকট এলেম হাসিল করার উদ্দেশ্যে জমা হইতে লাগিল। তখন ঐ আনসারী ব্যক্তিরও আফসোস হইল, বলিলেন, এই ছেলেটি আমাদের চাইতে অধিক বুদ্ধিমান ছিল। (দারিমী)

ফায়দা ঃ ইহাই ছিল ঐ বস্তু যাহা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে তাঁহার যুগে হিবরুল উম্মাহ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আলেম) ও বাহরুল এলেম (অর্থাৎ এলমের সাগর) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। ইন্তিকালের সময় তিনি তায়েফে ছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ)এর পুত্র মুহাম্মদ (রহঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইলেন এবং বলিলেন, আজ এই উম্মতের ইমামে রাব্বানী বিদায় হইয়া গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আয়াতের শানে নুযূল জানার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহাকে আলেমগণের শ্রেষ্ঠ কাতারে স্থান দিতেন। এইসব

তাঁহার সেই কঠোর শ্রম ও সাধনারই ফল ছিল। নতুবা যদি তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হওয়ার গর্ব লইয়া বসিয়া থাকিতন তবে এই মর্যাদা কিরূপে লাভ হইত। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার নিকট হইতে এলেম হাসিল করিবে তাহার সহিত বিনয় দেখাইবে। বুখারী শরীফে মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি এলেম শিখিতে লজ্জাবোধ করে অথবা অহংকার করে সে এলেম হাসিল করিতে পারিবে না।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে একটি অক্ষরও পড়াইয়াছে আমি তাহার গোলাম। সে আমাকে বিক্রিও করিতে পারে আযাদও করিতে পারে। ইয়াহয়া ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, এলেম আরাম আয়েশের মাধ্যমে লাভ হয় না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উদাসীনতার সহিত এলেম শিক্ষা করে সে কামিয়াব হইতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি বিনয় ও দরিদ্রতার সহিত এলেম হাসিল করিতে চাহে সে কামিয়াব ও সফলকাম হইতে পারে। মুগীরা (রহঃ) বলেন, আমরা আমাদের উস্তায ইবরাহীম (রহঃ)কে এমন ভয় করিতাম যেমন কোন বাদশাহকে ভয় করা হয়। ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন বহুত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, তিনি মুহাদ্দিসগণের যেরূপ সম্মান করিতেন তাহা আর কাহাকেও করিতে দেখি নাই। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, আমি বুযর্গদের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি উস্তাদের কদর করে না সে কৃতকার্য হয় না।

উপরোক্ত ঘটনায় একদিকে যেমন উস্তাযগণের সহিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর বিনয় ও নম্রতাসুলভ আচরণের কথা বুঝা যায় অপরদিকে এলেমের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ও অনুরাগের কথাও বুঝা যায়। যাহার কাছেই কোন হাদীস আছে বলিয়া জানিতে পারিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে চলিয়া যাইতেন এবং উহা হাসিল করিতেন। চাই উহাতে যত কষ্ট পরিশ্রমই হউক না কেন। আর ইহাও সত্য যে, বিনা পরিশ্রম ও বিনা কষ্টে এলেম তো দূরের কথা সাধারণ বস্তুও হাছিল হয় না। প্রবাদ আছে—

مَنْ طَلَبَ الْعُلٰى سَهِرَ اللَّيَالِى

"যে ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা কামনা করিবে সে রাত্রি জাগরণ করিবে।"

হারেছ ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে শুবরুমা, কা'কা এবং মুগীরা (রাযিঃ) তাঁহারা চারজন ইশার পর এলেমের বিষয় আলোচনা শুরু করিতেন।

ফজরের আযান পর্যন্ত একজনও পৃথক হইতেন না। লাইছ ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, ইমাম যুহরী (রহঃ) ইশার পর অযুর সহিত হাদীসের আলোচনা শুরু করিতেন আর এই অবস্থায় সকাল করিয়া দিতেন। (দারিমী)

দারাওয়ারদী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ)কে দেখিয়াছি, মসজিদে নববীতে ইশার নামাযের পর হইতে এক মাসআলা লইয়া বিতর্ক শুরু করিতেন, না তাহাদের মধ্যে কোনরূপ তিরস্কার বা ভর্ৎসনা হইত, আর না ভুল ধরাধরি হইত। এই অবস্থায় সকাল হইয়া যাইত এবং সেখানেই তাঁহারা ফজরের নামায আদায় করিতেন। (মুকাদ্দামা)

ইবনে ফুরাত বাগদাদী একজন মুহাদ্দিস ইন্তিকালের সময় আঠার সিন্দুক কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার নিজ হাতে লেখা ছিল। আর তাঁহার কৃতিত্ব এই যে, মুহাদ্দিসগণের নিকট বর্ণনার বিশুদ্ধতা হিসাবে তাঁহার লিখিত বিষয়গুলি নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে।

ইবনে জাওযী (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনবছর বয়সে তাঁহার পিতা মারা যান। এতীম অবস্থায় লালিত পালিত হন। তিনি এত মেহনত করিতেন যে, জুমআর নামায ব্যতীত বাড়ী হইতে দূরে যাইতেন না। একবার মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি এই অঙ্গুলির সাহায্যে দু'ই হাজার কিতাব খণ্ড লিখিয়াছি। তাঁহার স্বরচিত কিতাব ছিল আড়াই শতের উপর। কথিত আছে যে, তাঁহার সামান্য সময়ও নষ্ট হইত না। দৈনিক চার অংশ করিয়া লেখার নিয়ম ছিল। তাঁহার মজলিসে কখনও এক লক্ষেরও অধিক শাগরেদ অংশগ্রহণ করিত। রাজা-বাদশাহ এবং মন্ত্রীরাও তাঁহার দরসে বসিতেন। স্বয়ং ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, এক লক্ষ লোক আমার হাতে বয়াত হইয়াছে এবং বিশ হাজার লোক আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এতদসত্ত্বেও সেই যুগে শিয়াদের প্রভাব থাকার দরুন তাঁহাকে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। (তাযকেরাহ) হাদীস লেখার সময় কলম কুচি জমা করিয়া রাখিতেন। মৃত্যুকালে অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার গোসলের পানি যেন উহা দ্বারা গরম করা হয়। বর্ণিত আছে, এইগুলি দ্বারা গোসলের পানি গরম করার পরও কিছু অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল।

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ) হাদীসের বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে দশ লক্ষ হাদীস লিখিয়াছি।

ইবনে জারীর তবরী (রহঃ) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি সাহাবা এবং তাবেঈগণের জীবনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা করিয়া অভ্যাস ছিল। তাঁহার এন্তেকালের পর শাগরেদগণ প্রতিদিনের লিখার হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, বালেগ হওয়ার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত গড়ে দৈনিক তাঁহার লেখা চৌদ্দ পৃষ্ঠা করিয়া হয়। তাঁহার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বত্র পাওয়া যায়। যখন উহা রচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস পাইলে তো তোমরা আনন্দিত হইবে? লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আনুমানিক কত বড় হইবে? তিনি বলিলেন, প্রায় ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা। লোকেরা বলিল, ইহা সমাপ্ত করিবার আগে জিন্দেগী শেষ হইয়া যাইবে। তিনি বলিতে লাগিলেন; ইন্না লিল্লাহ! লোকদের হিম্মত কমিয়া গিয়াছে অতঃপর সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিলেন। এমনিভাবে তাঁহার তাফসীর লিখার সময়ও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার তাফসীর গ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বত্র পাওয়া যায়।

দারা কুতনী (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রের খ্যাতনামা লেখক। হাদীস সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি বাগদাদ, বসরা, কুফা, ওয়াসেত, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করিয়াছেন। একবার তিনি উস্তাদের মজলিসে বসিয়াছিলেন। উস্তাদ হাদীস পড়িতেছিলেন। আর তিনি কোন কিতাব নকল করিতেছিলেন। জনৈক সহপাঠী আপত্তি করিল যে, তুমিও অন্যমনস্ক হইয়া আছ। তিনি বলিলেন, আমার আর তোমাদের মনোযোগের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। বলত উস্তাদ এই পর্যন্ত কয়টি হাদীস শুনাইয়াছেন? সে চিন্তা করিতে লাগিল। দারা কুতনী (রহঃ) বলিলেন, শায়খ আঠারটি হাদীস শুনাইয়াছেন। প্রথমটি এই ছিল, দ্বিতীয়টি এই ছিল, এইরূপে ধারাবাহিকভাবে সব কয়টি হাদীস সনদ সহ শুনাইয়া দিলেন।

হাফেজ আছরাম (রহঃ) একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীস মুখস্থ করিবার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। একবার তিনি হজ্জ পালন করিতে গেলেন। সেখানে খোরাসানের দুইজন প্রসিদ্ধ হাদীসের উস্তাযও আসিয়াছিলেন এবং হরম শরীফে উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে হাদীসের দরস দিতেছিলেন। প্রত্যেকের নিকট ছাত্রদের বিরাট ভীড় ছিল। হাফেজ আছরাম উভয়ের মাঝখানে বসিয়া গেলেন এবং উভয়ের হাদীসসমূহ একই সময়ে লিখিয়া ফেলিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস

শিক্ষার ব্যাপারে তাহার মেহনত ও কষ্ট কাহারও অজানা নাই। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আমি চার হাজার উস্তাযের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াছি। আলী ইবনে হাসান (রহঃ) বলেন, একরাত্রে প্রচণ্ড শীত ছিল। আমি এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মসজিদ হইতে ইশার পর বাহির হইলাম। দরজায় দাঁড়াইয়া একটি হাদীস লইয়া পরস্পর আলোচনা শুরু হইয়া গেল। উক্ত হাদীস সম্পর্কে তিনিও কিছু মন্তব্য করিতেছিলেন আর আমিও কিছু মন্তব্য করিতেছিলাম। এইভাবে দাঁড়ানো অবস্থাতেই ফজরের আযান হইয়া গেল।

হুমাইদী (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ একত্র করিয়াছেন, সারা রাত্র জাগিয়া লিখিতেন। গ্রীষ্মকালে যখন গরমে বেশী কষ্ট পাইতেন, তখন একটি টবে পানি রাখিয়া উহাতে বসিয়া লিখিতেন। তিনি লোকসংশ্রব হইতে পৃথক থাকিতেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাহার কবিতা—

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيدُ شَيْئًا   سِوَى الْهَذْيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالٍ
فَأَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا   لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إِصْلَاحِ حَالٍ

অর্থাৎ, লোকজনের সহিত মোলাকাতের দ্বারা শুধু অনর্থক কথাবার্তা ও গল্পগুজব ছাড়া কোন ফায়দা হয় না। অতএব তুমি লোকদের সহিত সাক্ষাৎ কমাইয়া দাও। তবে এলেম হাসিলের জন্য উস্তাদের সহিত এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পার।

ইমাম তাবারানী (রহঃ) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বহু কিতাব রচনা করিয়াছেন। কেহ তাঁহার লিখিত এত বেশী পরিমাণ কিতাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, কিভাবে লিখিলেন? উত্তরে বলিলেন, আমি ত্রিশ বছর চাটাইয়ের উপর কাটাইয়াছি। অর্থাৎ তিনি দিবারাত্র চাটাইয়ের উপর পড়িয়া থাকিতেন। আবুল আব্বাস সিরাজী (রহঃ) বলেন, আমি তাবারানী (রহঃ) হইতে তিন লক্ষ হাদীস লিখিয়াছি।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) নাসেখ (রহিতকারী) হাদীস অত্যন্ত কঠোরভাবে যাচাই করিতেন। কুফা নগরীকে তদানীন্তন কালে এলেমের ঘর বলা হইত। তিনি সেখানকার সমস্ত মুহাদ্দিসীনের হাদীসসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন আর যখন বহিরাগত কোন মুহাদ্দিস আসিতেন তখন তিনি ছাত্রদিগকে হুকুম করিতেন খোঁজ লইয়া দেখ যে, তাহার নিকট এমন কোন হাদীস আছে কিনা যাহা আমাদের নিকট নাই। ইমাম সাহেবের সেখানে একটি এলমী মজলিস ছিল। উহাতে মুহাদ্দিস, ফকীহ ও

ভাষাবিদগণের সমাগম ছিল। যে কোন মাসআলা উপস্থিত হইত তখন ঐ মজলিসে উহার উপর আলোচনা হইত। কোন কোন সময় একমাস পর্যন্তও আলোচনা চলিতে থাকিত। অবশেষে যাহা সিদ্ধান্ত হইত উহা মাযহাব হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হইত।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)এর নাম কে না জানে। হাদীস মুখস্থ করা ও মুখস্থ রাখা তাঁহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি দৃষ্টান্তমূলক ছিল। জনৈক মুহাদ্দিস তাঁহার পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমন চল্লিশটি হাদীস শুনাইলেন যাহা সকলের জানা ছিল না। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাহা হুবহু শুনাইয়া দিলেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি মক্কা মোকাররমার পথে এক শায়খের লিখিত হাদীসসমূহের দুইটি খণ্ড লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে স্বয়ং উক্ত শায়খের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। আমি দরখাস্ত করিলাম যে, ঐ উভয় খণ্ডের হাদীসগুলি সরাসরি উস্তাদের নিকট হইতে শুনিয়া লইব। তিনি রাজী হইলেন। আমার ধারণা ছিল যে, ঐ দুইটি খণ্ড আমার সঙ্গেই রহিয়াছে। কিন্তু যখন তাঁহার নিকট গেলাম তখন দেখিলাম ঐগুলির পরিবর্তে দুইটি সাদা খাতা হাতে রহিয়াছে। উস্তাদ হাদীস শুনাইতে শুরু করিলেন। হঠাৎ আমারহাতে সাদা খাতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমার লজ্জা হয় না? আমি বিষয়টি খুলিয়া বলিলাম এবং এই আরজ করিলাম যে, আপনি যাহা শুনান তাহার আমার মুখস্থ হইয়া যায়। উস্তাদের বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, শুনাও। আমি সমস্ত হাদীস শুনাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, এইগুলি হয়ত তোমার পূর্ব হইতে মুখস্থ ছিল। আমি আরজ করিলাম কোন নূতন হাদীস শুনাইয়া দিন। তিনি আরও চল্লিশটি হাদীস শুনাইয়া দিলেন। আমি ঐগুলিও সাথে সাথে শুনাইয়া দিলাম এবং একটিও ভুল করিলাম না। মুহাদ্দিসগণ হাদীস মুখস্থ করা ও উহার প্রচারের ব্যাপারে যেসব মেহনত ও কষ্ট করিয়াছেন উহার অনুসরণ তো দূরের কথা হিসাব করাও দুষ্কর।

কারতামা (রহঃ) নামেও একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তত প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার জনৈক শাগরেদ দাউদ (রহঃ) বলেন, লোকেরা আবু হাতেম প্রমুখের স্মৃতিশক্তির কথা বর্ণনা করে। আমি কারতামা (রহঃ) হইতে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী কাহাকেও দেখি নাই। একবার আমি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, এই সমস্ত কিতাব হইতে যেটি তোমার মনে চায় উঠাইয়া লও আমি শুনাইয়া দিব। আমি কিতাবুল

আশরিবা উঠাইয়া লইলাম। তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষ দিক হইতে শুরুর দিকে পড়িয়া গেলেন এবং পুরা কিতাব শুনাইয়া দিলেন।

আবু যুরআ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহঃ) বলেন, আমি এক লক্ষ হাদীস সংকলন করিয়াছি। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার হাদীস আমার মুখস্থ আছে। খাফ্ফাফ (রহঃ) বলেন, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহঃ) আমাদিগকে এগার হাজার হাদীস মুখস্থ লিখাইয়াছেন। অতঃপর সেগুলি ধারাবাহিকভাবে শুনাইয়াছেন। কোন একটি অক্ষরও বেশ কম হয় নাই।

আবু সাদ ইস্পাহানী বাগদাদী (রহঃ) ষোল বছর বয়সে আবু নসর (রহঃ)এর নিকট হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে বাগদাদ পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়াই চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাহার সনদ কোথায় পাইব! চরম দুঃখে চিৎকার করিয়া কান্না তখনই আসিতে পারে যখন কোন জিনিসের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মহব্বত হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ মুসলিম শরীফ তাঁহার মুখস্থ ছিল এবং শাগরেদদিগকে মুখস্থই লিখাইতেন। এগার বার হজ্জ করিয়াছেন। খানা খাইতে বসিলে চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত।

আবু ওমর যারীর (রহঃ) জন্মান্ধ ছিলেন। তথাপি হাদীসের হাফেজ ছিলেন। ফিকাহ, ইতিহাস, ফারায়েয এবং অংকে পারদর্শী ছিলেন।

আবুল হোসাইন ইস্পাহানী (রহঃ)এর বুখারী ও মুসলিম শরীফ উভয়টি মুখস্থ ছিল। বিশেষ করিয়া বুখারী শরীফের অবস্থা এই ছিল যে, যে কেহ সনদ পড়িলে মতন অর্থাৎ হাদীস পড়িয়া দিতেন। আর হাদীস পড়িলে সনদ পড়িয়া দিতেন।

শাইখ তকী উদ্দীন বালাবাক্কী (রহঃ) চার মাসে সম্পূর্ণ মুসলিম শরীফ মুখস্থ করিয়াছিলেন। এমনিভাবে জমা বাইনাস–সাহীহাইনেরও হাফেজ ছিলেন। (জমা' বাইনাস সাহীহাইন হইল, আল্লামা হুমাইদী (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত কিতাব, ইহাতে বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবের হাদীস সংকলন করা হইয়াছে।)

তাঁহার কারামত প্রকাশ পাইত। তিনি কুরআনে পাকেরও হাফেয ছিলেন। বলা হয়, তিনি সম্পূর্ণ সূরা আনআম একদিনে হিফজ করিয়াছিলেন।

ইবনুস সুন্নী (রহঃ) ইমাম নাসায়ী (রহঃ)এর প্রসিদ্ধ শাগরেদ ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীস লিখার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার ছেলে বলেন, আমার পিতা হাদীস লিখিতে লিখিতে এক পর্যায়ে দোয়াতে

কলম রাখিয়া দোয়ার জন্য হাত উঠাইলেন এবং এই অবস্থায়ই তাঁহার ইন্তিকাল হইয়া গেল।

আল্লামা সাজী (রহঃ) বাল্যকালেই এলমে ফিকাহ হাসিল করিয়াছিলেন। অতঃপর এলমে হাদীসে মনোনিবেশ করেন। হিরাতে দশবছর অবস্থান করেন এবং তথায় অবস্থানকালে ছয় বার তিরমিযী শরীফ নিজ হাতে লিখিয়াছেন।

ইবনে মান্দাহ (রহঃ)এর নিকট গারায়েবে শূরা নামক হাদীস গ্রন্থ পড়িতেছিলেন। এই অবস্থায় এশার নামাযের পর ইবনে মান্দাহ (রহঃ)এর ইন্তিকাল হইয়া যায়। শাগরেদের চাইতেও উস্তাদের এলমী অনুরাগ লক্ষণীয়। কেননা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পড়াইতে থাকিলেন।

আবু আমর খাফফাক (রহঃ)এর এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল।

ইমাম বুখারী (রহঃ)এর উস্তায আসেম ইবনে আলী (রহঃ) যখন বাগদাদে পৌঁছেন, তখন শিক্ষার্থীদের এত ভিড় হইত যে, অধিকাংশ সময় ছাত্রসংখ্যা এক লাখেরও অধিক হইয়া যাইত। একবার আনুমানিক হিসাব করা হইলে এক লক্ষ বিশ হাজার হইল। এই জন্যই কোন কোন শব্দ একাধিকবার বলিতে হইত। তাঁহার এক শাগরেদ বলেন, একবার 'হাদ্দাছানাল্লাইছ' বাক্যটি চৌদ্দবার বলিতে হইয়াছে। স্বাভাবিক কথা, সোয়া লক্ষ মানুষের নিকট আওয়াজ পৌঁছাইতে হইলে কোন কোন শব্দ একাধিকবার বলিতেই হইবে।

আবু মুসলিম বসরী (রহঃ) যখন বাগদাদে পৌঁছেন তখন বিরাট এক মাঠে হাদীসের দরস শুরু হয়। সাত জন লোক দাঁড়াইয়া লিখাইত, যেমনভাবে ঈদের তাকবীরসমূহ বলা হইয়া থাকে। সবক শেষে দোয়াত গণনা করা হইলে তাহা চল্লিশ হাজারেরও অধিক ছিল। আর যাহারা কেবল শুনিয়াছে তাহারা উহাদের হইতে অতিরিক্ত। ফিরয়াবী (রহঃ)এর মজলিসে যাহারা লিখাইতেন তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' ষোল। ইহাতে ছাত্রসংখ্যার অনুমান আপনা আপনিই হইয়া যায়। এই মেহনত ও কষ্টের বদৌলতেই এই পবিত্র এলেম আজ পর্যন্ত জিন্দা রহিয়াছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আমি ছয় লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই করিয়া বুখারী শরীফ লিখিয়াছি। ইহাতে সাত হাজার দুইশত পঁচাত্তরটি হাদীস আছে। প্রতিটি হাদীস লিখার সময় দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিয়া লিখিয়াছি। যখন বাগদাদ পৌঁছেন তখন সেখানকার মুহাদ্দিসগণ এইরূপে তাঁহার পরীক্ষা লইলেন যে, দশজন লোক নির্ধারিত হইলেন। প্রত্যেকেই দশটি করিয়া হাদীস বাছাই করিলেন এবং সেইগুলিকে উলট

পালট করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে 'আমার জানা নাই' বলিতে থাকিলেন। যখন দশজনের প্রত্যেকের প্রশ্ন করা শেষ হইল তখন তিনি সর্বপ্রথম প্রশ্নকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি সর্বপ্রথম এই হাদীস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভুল, উহার বিশুদ্ধ বর্ণনা এইরূপ। এমনি ভাবে দ্বিতীয় হাদীস এই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উহা আপনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভুল, উহার বিশুদ্ধ বর্ণনা এইরূপ। মোটকথা এমনিভাবে একশতের একশত হাদীসই ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়া দিলেন। প্রত্যেকটি হাদীস প্রথমে ঐভাবে পড়িতেন যেভাবে পরীক্ষক পড়িয়াছিলেন। অতঃপর বলিতেন যে, ইহা ভুল এবং বিশুদ্ধ এইরূপে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) চৌদ্দ বৎসর বয়সে হাদীস পড়িতে শুরু করেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত উহাতেই মশগুল থাকেন। নিজেই বলেন যে, আমি তিন লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই করিয়া মুসলিম শরীফ রচনা করিয়াছি। ইহাতে বার হাজার হাদীস রহিয়াছে।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি পাঁচ লক্ষ হাদীস শুনিয়াছি, উহার মধ্য হইতে বাছাই করিয়া সুনানে আবু দাউদ শরীফ রচনা করিয়াছি, উহাতে চার হাজার আটশ হাদীস রহিয়াছে।

ইউসুফ মিয্যী (রহঃ) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আসমাউর রিজাল অর্থাৎ সনদ সম্পর্কিত শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। প্রথমে নিজ শহরে ফিকাহ ও হাদীস শিক্ষা করেন। তারপর মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, হলব, হামাত, বালা বাক্কা প্রভৃতি শহর সফর করেন। বহু কিতাব তিনি হাতে লিখিয়াছেন। 'তাহযীবুল কামাল' দুইশ খণ্ড এবং 'কিতাবুল আতরাফ' আশি খণ্ডেরও ঊর্ধ্বে রচনা করিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন। কাহারো সহিত কথাবার্তা খুবই কম বলিতেন। অধিকাংশ সময় কিতাব দেখার মধ্যে মশগুল থাকিতেন। হিংসুক লোকদের হিংসার শিকারও হইয়াছেন। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই।

এই সমস্ত মনীষীর জীবনী পুরাপুরি বর্ণনা করা কঠিন কাজ। বড় বড় কিতাবও তাঁহাদের জীবনী ও সাধনার কথা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এখানে কেবল নমুনাস্বরূপ দুই চারটি ঘটনা এইজন্য বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যাহাতে এই কথা বুঝা যায় যে, এলমে হাদীস যাহা আজ সাড়ে তেরশ' বৎসর যাবৎ অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত টিকিয়া রহিয়াছে তাহা কোন মেহনত ও সাধনার বদৌলতেই টিকিয়া রহিয়াছে। আজ

যাহারা এলেম হাসিল করিবার দাবী করে এবং নিজেদেরকে তালেবে এলেম বলিয়া দাবী করে তাহারা উহার জন্য কতটুকু মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করে। আমাদের যদি এই কামনা হয় যে, আমাদের ভোগবিলাসিতা, আরাম-আয়েশ, বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ ঠিক থাকুক এবং আমরা দুনিয়ার কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকি আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কালামের প্রচার প্রসারও ঐভাবেই ঘটিতে থাকুক, তবে ইহা শুধু অবাস্তব কল্পনা ও পাগলামী ব্যতীত আর কি হইতে পারে।

নবম অধ্যায়

হুযূর (সাঃ)এর আনুগত্য ও হুকুম তামিল করা এবং হুযূর (সাঃ)এর মনোভাব কি তাহা লক্ষ্য করা

এমনিতেই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের প্রতিটি কাজ আনুগত্য ছিল। পূর্বে বর্ণিত ঘটনাসমূহ দ্বারাও এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবু বিশেষ করিয়া কয়েকটি ঘটনা এই অধ্যায়ে এইজন্য বর্ণনা করা হইতেছে, যাহাতে আমরা এইসব ঘটনার সহিত নিজেদের অবস্থাকে বিশেষভাবে তুলনা করিয়া দেখিতে পারি যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমসমূহের আনুগত্য কতটুকু করি। যেহেতু আমরা সবসময় ইহারও আশা করি যে, যেই সকল বরকত, উন্নতি ও ফলাফল সাহাবায়ে কেরামগণ লাভ করিতেন আমরাও যেন উহা লাভ করিতে পারি। বাস্তবিকই যদি আমরা উহার আশা করিয়া থাকি তবে আমাদেরও উহাই করা উচিত যাহা তাঁহারা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ)এর চাদর জ্বালাইয়া ফেলা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) বলেন, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একবার সফরে ছিলাম। আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। আমার গায়ে ছিল হালকা কুসুম রংয়ের একটি চাদর ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া বলিলেন, ইহা কি গায়ে দিয়া রাখিয়াছ? এই প্রশ্ন হইতে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করিলাম। আমি পরিবারের লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম, ঐ সময় তাহারা চুলা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। আমি চাদরটি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া দিলাম।